قيمة الزمن عند العلماء

সময়ের মূল্য বুঝতেন যাঁরা

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.
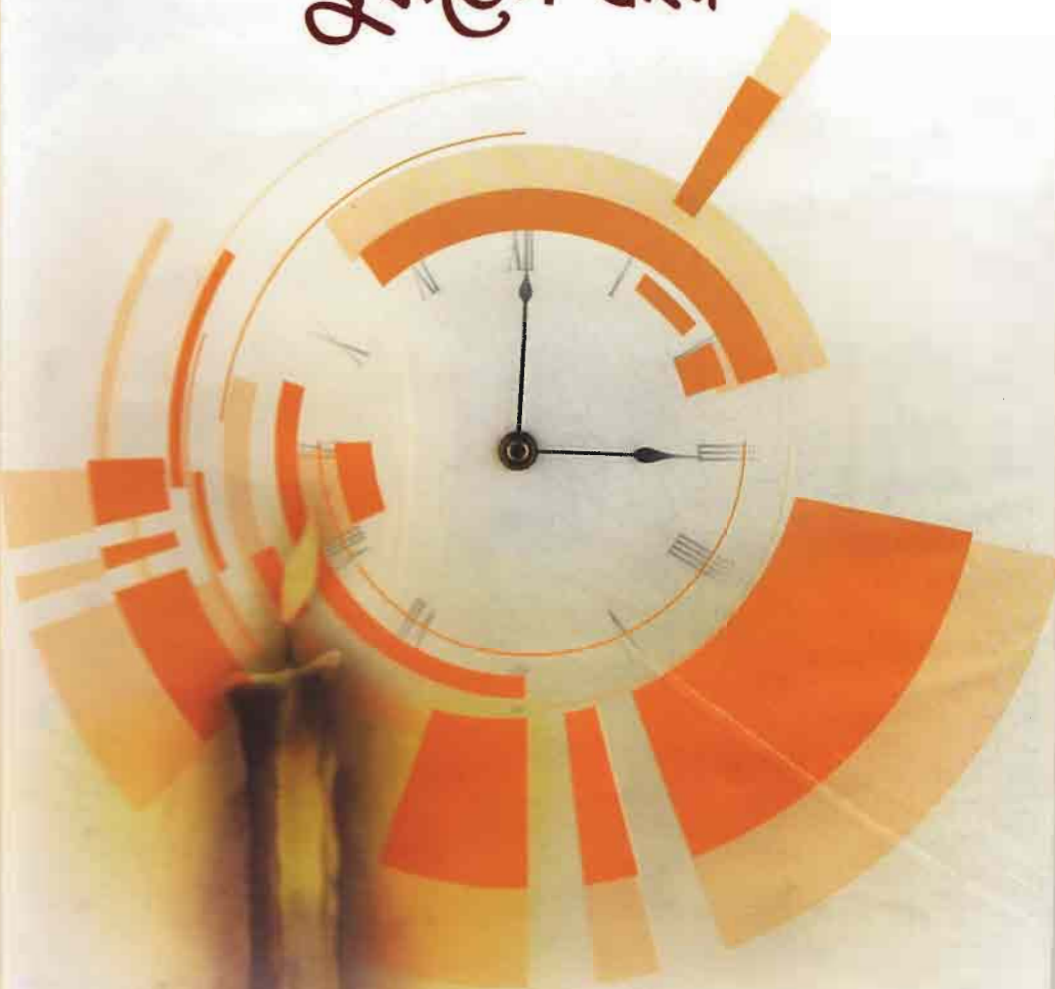
সময়ের মূল্য বুঝতেন যাঁরা ■ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.

সময়ের মূল্য বুঝতেন যাঁরা

মূল

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা ইমরানুল হক

মাদরাসাতুত তাকওয়া

সরাইল, শহীদবাড়িয়া।

সম্পাদনা

হাবীবুর রহমান নদভী

শিক্ষক, মাদরাসাতুল মাদীনাহ

আশরাফাবাদ, ঢাকা।

মাকতাবাতুত্ তাকওয়া

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশনায়
ইবন সামসুজ্জামান (কুতুব ভূঁইয়া)
মাকতাবাতুত্ তাকওয়া
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০

প্রথম প্রকাশ
জিলহজ্জ : ১৪৩৩ হিজরী
নভেম্বর : ২০১২ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ
সফর : ১৪৩৪ হিজরী
জানুয়ারি : ২০১৩ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটারস
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণ
শাহ শরীফ প্রিন্টার্স
৫২ আরামবাগ, ঢাকা।

উৎসর্গ

সময় সংরক্ষণে সচেষ্ট থেকে যাঁরা এ উম্মাহকে ইলমী সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন এবং আজও যাঁরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

–অনুবাদক

আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা.বা.)-এর দু'আ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين.

وبعد! فإن كتاب المحدث المسند الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله
الذي سماه "قيمة الزمن" كتاب جيد ينبغي أن يستفيد منه العلماء
والطلاب والمسلمون الذين يحرصون على أن يجعلوا حياتهم بل أوقات
عمرهم ذات قيمة، ورأيت أن الأستاذ عمران الحق سلمه الله تعالى قد نقل
الكتاب إلى اللغة البنغالية الفصحى، لتعميم الفائدة،

وحيث أن المؤلف رحمه الله كان أستاذي وشيخي وقابلته مرة في ندوة
العلماء بالهند وأجازني لرواية الحديث عنه أجلّه وأحبه كثيرا، وأحب
أن أستفيد بكل ما يصدر من مؤلفاته القيمة،

فجزى الله المترجم خير الجزاء وبارك في جهوده العلمية ونفع بأعماله الكل،
وأدعو الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضى ويسدد خطاه، آمين.

كتبه: محمد سلطان ذوق الندوي

٦/١/١٤٣٣ هـ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর আর দুরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের প্রতি এবং তাঁদের প্রতি, যাঁরা বিচারদিন পর্যন্ত তাঁদের পথ অনুসরণ করবেন।

পরকথা হল, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) সংকলিত "قيمة الزمن عند العلماء" একটি অনবদ্য গ্রন্থ। উলামা, তালাবা এবং সময়ের সদ্ব্যবহারে আগ্রহী সকল মুসলমানের এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। মাওলানা ইমরানুল হক– আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখুন– কিতাবটির উপকারিতা সার্বজনীন করণের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ বাংলায় এর অনুবাদ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, কিতাবটির সংকলক শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (রহ) এর শিষ্যত্ব ও তাঁর সনদেহাদীছের ইজাযত লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। হিন্দুস্তানে নদওয়াতুল ওলামায় যখন আমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করি, তখন তিনি আমাকে তাঁর সনদে হাদীছ বর্ণনার 'ইজাযাত' দেন। তাঁর ভালোবাসা ও সম্মান আমার হৃদয় যমীনে প্রোথিত। আর তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ থেকে উপকৃত হওয়া আমার একান্ত কাম্য।

পরিশেষে আমি দুআ করি, আল্লাহ অনুবাদককে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, তার ইলমী সাধনায় বরকত দান করুন এবং তা দ্বারা মানুষকে উপকৃত করুন। আর তিনি তাকে তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় কর্ম সম্পাদন করার তাওফীক দান করুন এবং তার পথ চলার পদক্ষেপকে সঠিক রাখুন। আমীন।

মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী
৬ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী

সম্পাদকের কথা

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত قيمة الزمن عند العلماء অত্যন্ত মূল্যবান একটি গ্রন্থ। উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ এই গ্রন্থের সাবলীল বাংলা অনুবাদ বেশ দুরূহ। নবীন অনুবাদক মাওলানা ইমরানুল হক যথেষ্ট শ্রম ও সময় ব্যয় করে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। এরপর এই অনুবাদকর্মকে 'পরিবেশন যোগ্য' করতে আমি অধম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের যোগ্যতার পরিধি সীমিত। আশা করি পাঠক আমাদের সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমাসুন্দর ও উদার দৃষ্টিতে দেখবেন। সচেতন পাঠকের সুচিন্তিত মতামত ভবিষ্যতে গ্রন্থটিকে আরও ভালো অবস্থায় প্রকাশ করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। মূল্যবান এই অনুবাদগ্রন্থ অধ্যয়নে পাঠক যেন তার ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সময়ের সদ্ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হতে পারেন এবং সালফেসালেহীনের সার্থক উত্তরসূরী হতে পারেন- এই আমাদের প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদেরকে পুণ্য ও কল্যাণকর্মে একে অন্যের সহযোগী করুন এবং আমাদের সকল নেক আমল কবুল করুন। আমীন।

হাবীবুর রহমান নদভী
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, ঢাকা
২৫ শে শাওয়াল ১৪৩৩ হিজরী

অনুবাদকের কথা

আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগের কথা। তখন আমি শহীদবাড়ীয়া জেলাধীন হরষপুর গ্রামের দারুল উলূম মাদরাসার হেফয বিভাগের তালিবুল ইলম। আমার উস্‌তায হাফেয নূরুজ্জামান ছাহেব (দা.বা.)।

আমার 'হৃদয়-যমিনে' বাংলা ভাষার চর্চা ও বাংলা লেখার অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগের প্রথম বীজটি রোপিত হয় তাঁরই হাতে।

আমার এই উস্‌তাযের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সীমিত। কিন্তু তিনি স্বশিক্ষিত। তাঁর লিখন-ক্ষমতা সত্যিই আশ্চর্যজনক। তাঁর রচিত আল্লামা ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) এর জীবনী গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁরই মুখে আমি প্রথম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এর কথা শুনেছি। আর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মপরিধি সম্পর্কে জেনেছি।

হাফেয ছাহেব হুযুরের কাছেই আমার বাংলা চর্চার হাতেখড়ি। মাদরাসার তাহছীলের প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন জনের কাছে চিঠি লিখতেন। মাঝে মাঝে সেগুলো আমাকে পড়ে শোনাতেন। আমি বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে শুনতাম। আর মনে মনে বলতাম, হায়, আমিও যদি এমনভাবে লিখতে পারতাম!

তখন থেকেই আমার মাঝে জাগ্রত হয়েছে কলম ধরার প্রেরণা এবং লেখক হওয়ার বাসনা।

হেফয শেষ করার পর আল্লাহর অনুগ্রহে মাদরাসাতুল মাদীনায় অধ্যয়নের সুযোগ হয়। এখন তো অভিভাবকগণ আদীব হুযুর ও তাঁর প্রণীত নেছাব সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি নিয়েই সেখানে ভর্তি করেন, কিন্তু আমাদের সময়ে বিষয়টি তেমন ছিল না। আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এই কাফেলায় শামিল করে দিয়েছিলেন।

মাদরাসাতুল মাদীনার অনুকূল পরিবেশে সেই সুপ্ত বীজটি অঙ্কুরিত হয়ে স্নিগ্ধ আলোর পরশ লাভ করল।

প্রথম তিন বছর 'আল-কলম' (পুষ্প)ই ছিল আমার এ পথের দিশারী।

এরপর আলিয়া-তে পরীক্ষা দেয়ার পারিবারিক চাপ[১] সামলাতে গিয়ে নদভী হুযুরের (দা.বা.) পরামর্শে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে, দারুল মা'আরিফে ভর্তি হলাম। সেখানে পেলাম আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা.বা.) এর বিশাল ব্যক্তিত্বের সুশীতল স্নেহ, ছায়া এবং অকৃত্রিম মমতা ও ভালবাসা। দেখতে

---

[১] মূলত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যই এই চাপ এসেছিল।

দেখতে দারুল মাআরিফে চার বছর কেটে যায়। চার বছর শেষ করে দারুল মা'আরিফ থেকে ফারেগ হয়ে কিশোরগঞ্জ শোলাকিয়ায় মাওলানা ইসমাইল ছাহেব (পীর ছাহেব হুযুর) এর 'মাদরাসায়ে বাগে জান্নাত' এ খেদমতে নিয়োজিত হই। এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট মুহাদ্দিস এবং সুলেখক শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবুগুদ্দাহ কর্তৃক রচিত এই মূল্যবান কিতাবটির অনুবাদ শুরু করি।

প্রায় এক বছর পর কিতাবটির অনুবাদ যখন সমাপ্ত হয় তখন আমি ঢাকায়, বাসাবোস্থ মাদরাসাতুল হুদার শিক্ষক। তারপর নিজের যোগ্যতার গণ্ডিতে যতদূর সম্ভব অনুবাদ পরিমার্জনা করে নদভী হুযুরের কাছে অর্পণ করি। মাদরাসাতুল হুদার ইউসুফ, মাইমুন, শাফায়াত ও ইকবাল সাগ্রহে পরিচ্ছন্ন অনুলিখনের কাজটি আঞ্জাম দিয়েছিল। আল্লাহ্ তাদের জাযায়ে খায়র দান করুন।

এদিকে প্রায় একই সময়ে মাকামাতে হারীরীর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করি এবং সে কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এই কিতাবটি প্রায় ৭/৮ মাস খাতার ভেতরে বন্দী হয়ে থাকে।

তারপর কিতাবটির প্রথম দিকের কিছু পৃষ্ঠা কম্পোজ করে কিতাবের মূল লেখক শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ছাহেবের প্রত্যক্ষ শাগরেদ মুফতী আবদুল মালেক ছাহেব (দা.বা.) এর সামনে পেশ করি।

এ উপলক্ষে দীর্ঘক্ষণ মুফতী ছাহেব হুযুরের কাছে অবস্থান করলাম। বেশ ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে সময় দিলেন। আপ্যায়নপর্ব শেষে তিনি অনূদিত পৃষ্ঠাগুলো পড়লেন এবং অনুবাদের ভাষাটাকে আরেকটু সহজ ও মসৃণ করার পরামর্শ দিলেন।

এরও প্রায় ৭/৮ মাস পর নদভী হুযুরের প্রাথমিক পরিমার্জনার পর পূর্ণ বইটি কম্পোজ হয়ে এল। দ্বিতীয় প্রুফ দেখার পর মনে হল, এবার মুফতী আবদুল মালেক ছাহেব (দা.বা.) এর সামনে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পেশ করে একটি ভূমিকা বা অন্তত একটি দু'আবাক্যের আবেদন জানাব।

মুফতী ছাহেব হুযুরের কাছে ফোন করে সাক্ষাতের অনুমতিপ্রার্থনা করলাম। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু জানার পর হুযুর দরদমাখা কণ্ঠে বললেন, "দেখ, তোমার পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখতে দিলে ব্যস্ততার কারণে দীর্ঘদিন এটা এখানেই পড়ে থাকবে। এরচে' ভাল তুমি এটা প্রকাশের কাজে এগিয়ে যাও। তাছাড়া নদভী ছাহেব তো দেখেছেনই! আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ এই খেদমতকে কবুল করুন।" তখন আমি নিরুপায় হয়ে ক্ষীণস্বরে "আমীন" বললাম। এরপর আর কিছু বলা বা পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত মনে হলো না।

তৃতীয় প্রুফ যখন দেখতে শুরু করলাম তখন হঠাৎ মনে হল– মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব তো দু'আ ও প্রেরণা দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন কিন্তু একজন মুরুব্বীর লিখিত দু'আ থাকলে মনে হয় আরো ভাল হয়। এই ভাবনার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ২০ রমজান ১৪৩৩ হিজরী দারুল মা'আরিফের উদ্দেশ্যে সফর করলাম। যওক হুযুরের সাথে যখন দেখা হল তখন প্রায় দুপুর ১২ টা। সাক্ষাতের শুরুতেই হুযুরকে আমার সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করলাম।

আজ রাতেই হুযুর ইতিকাফে বসবেন। তাই অনেক ব্যস্ততা। তা সত্ত্বেও প্রায় দেড়ঘণ্টাব্যাপী হুযুর বইটির আদ্যপ্রান্ত পড়লেন। কয়েক স্থানে লাল কালির আঁচড়ে আমাকে ধন্য করলেন। এক জায়গায় আমি ثوب قطرىٌّ এর অনুবাদ করেছিলাম "কাতারী কাপড়" হুযুর নিজে উঠে গিয়ে শামায়েলে তিরমিযী আনলেন এবং আমার অনুবাদ শুধরে দিলেন, লিখলেন–

(یمنی منقش کپڑا নকশাকৃত ইয়ামানী কাপড়)। যাওক সাহেব হুযুরের এই আচরণে আমি অভিভূত হলাম। সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে অবশেষে হুযুর বললেন– এনামের[১] কাছে তোমার ই- মেইল ঠিকানা দিয়ে যাও আমি পরবর্তীতে দুই সপ্তাহ পর আমার মন্তব্য পাঠিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযুর থেকে দু'আ চেয়ে বিদায় নিলাম দুই সপ্তাহ পর। এনাম ভাই ও শাহেদ ভাইয়ের সহযোগিতায় হুযুরের মন্তব্যটি আমার হাতে পৌঁছল। এখন বন্ধুবর শাহাদাৎ ভাইয়ের প্রচেষ্টায় বইটি মুদ্রিত হওয়ার পথে। আল্লাহ তাকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকৃত ইখলাস ও কবুলিয়াত দান করুন।

আল্লাহ তা'আলা এই অনুবাদগ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

পরিশেষে পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, তারা যেন অনূদিত এই কিতাবটির মাকবুলিয়্যাতের জন্য এবং অধম অনুবাদকের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের জন্য দু'আ করেন।

ইমরানুল হক
মাদরাসাতুত্ তাকওয়া
সরাইল, শহীদবাড়ীয়া
৯ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী

---

১. হুযুরের বিশেষ খাদেম ও দারুল মা'আরিফের উস্তায। আল্লাহ্ তার 'খায়র' করুন।

প্রকাশকের কথা

জীবন তো কল্পনা, পরিকল্পনা আর স্বপ্ন বিলাসের নাম নয়। বাস্তবতাই জীবন। যাদের বর্তমান ভাল, তাদের অতীত ভাল, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। তবে ভবিষ্যত ভাল হওয়ার জন্য প্রয়োজন চেষ্টা, সাধনা। আমি প্রকাশনা জগতে বিচরণ করব এমন চিন্তা কখনও আমার ছিল না। ছিল ভিন্ন আশা, ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের প্রতি যথেষ্ট অন্যায় অবহেলা করেছি, একসময় আমার বক্তৃতা, উপস্থাপনা শ্রোতাদের মন জয় করত। কিন্তু...! জীবন চলার পথে, কত অভাবিত ঘটনা ঘটে থাকে। সেই আঁকাবাঁকা পথের কোন এককোণে দেখা হয়, মানুষটির সাথে, ১৪২৩/২৪ বর্ষে। মুতালাআ মোযাকারার পাশাপাশি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা ভাগাভাগি করতাম। আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা এক সাথে আছি একই সাথে পথ চলব। কিন্তু কালের আবর্তনে, আমাদের চলার পথ ভিন্ন হয়ে যায়। ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয় দীর্ঘ সময়। কালপরিক্রমায় আজ আমি প্রকাশক আর তিনি লেখক। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ সংকলিত قيمة الزمن عند العلماء -এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আজ আমি খুবই আনন্দিত। কিতাবখানি তালেবানে ইল্‌ম তথা আমাদের সকলের জন্য মূল্যবান পাথেয়। হে আল্লাহ! তোমার দয়া ও রহমত অসীম, বান্দার পাথেয় ও পরিধি সসীম। আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও, আমাকে খেদমতের শক্তি দাও, এখলাছ দাও, বর্তমানের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য, আমাকে দান কর সব কল্যাণ, দূর কর সব অকল্যাণ। মন দাও, দাও সুন্দর শৈলী যার মাধ্যমে অংকুরিত হবে লেখার ও প্রকাশনার সুন্দর বীজ। আমীন।

ইবনে সামসুজ্জামান
(কুতুব ভূঁইয়া)

ভূমিকা

الحمدُ لله الذى علّم بالقلم، علّم الانسانَ ما لم يعلم، وأرسلَ إلينا رسولَه النبّى المكرَّم، سيِّدَنا محمدا صلى الله عليه وسلّم، ورضى الله عن أصحابه و تابعيهم بإحسان ومن سَارَ على سننهم، فعَلِمَ وعلَّم أو تعلَّم، أما بعد :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মানিত গ্রন্থে এবং তাঁর মহান নবীর যবানে সময়ের গুরুত্ব এবং আমাদের জীবনে ও কাজে-কর্মে সময়নিষ্ঠতা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি আমাদের প্রতি শরীয়তের বিধি-বিধান আরোপ করেছেন এবং সেগুলো পালনের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর সেই নির্ধারিত সময়ে তা আদায়ের ক্ষেত্রে শিথিলতা ও অলসতা করা থেকে সতর্ক করেছেন। এর মাঝে কি আমাদের জন্য কোন শিক্ষা নেই? নেই কি সময়-সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতার মূল্যবান দীক্ষা? সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা :

إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔

সালাত তো মুমিনদের উপর সময় নির্ধারিত একটি ফরয।

হাদীছ শরীফেও এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّه بن مسعود رضى الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلّم : – أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ، قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ــــ (رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচে' প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে আদায়কৃত সালাত।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

মুসলিম নারী-পুরুষ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। এভাবে কোন মুসলমান যদি শরীয়তের চাহিদা মাফিক ওয়াক্তের শুরুতেই সালাত আদায়

করতে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে সময় সংরক্ষণ, সময়ানুবর্তিতা, প্রতিশ্রুত সময়ের প্রতি সূক্ষ্মসজাগতা তার অভ্যাসে পরিণত হবে। যা তাকে পরিপূর্ণতার সাথে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে এবং তার মাঝে প্রতিটি কাজ মুনাসিব সময়ে করার স্পৃহা সৃষ্টি করবে।

কেন আল্লাহতা'আলা এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়সম্পৃক্ত বহু বিধান থেকে সালাতকে বিশিষ্ট করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের সামনে এর প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। আর তা হল, সালাত এমন একটি আমল যা প্রতিদিন পাঁচবার পুনঃপুনঃ সংঘটিত হয়, ফলে কিছুদিন যেতে না যেতেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত আদায়কারীর আচরণে সময় সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতার স্বভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ধীরে ধীরে তা তার জীবন ও আচরণে এক বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হয়।

আমাদের আল্লাহমুখী শরীয়ত আমাদের জন্য সালাত ব্যতীত বহু বিধানের ক্ষেত্রেও সময়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। যেমন হজ্জ, যাকাত, সাওম, সদাকায়ে ফিতর, কোরবানী, সফর, তায়াম্মুম, পা-মোজার উপর মাসেহ,
স্তন্যদান, তালাক প্রদান, ইদ্দতপালন, তালাক প্রত্যাহার, স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান, ঋণ লেনদেন, বন্ধক আদান-প্রদান, অতিথি-আপ্যায়ন, আকীকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও শরীয়ত সময়কে সম্পৃক্ত করেছে।

আর শরীয়ত তা করেছে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে এবং তার মাধ্যমে বিশেষ কল্যাণ ও উপকার লাভ করার জন্যে। অথচ বহু মুসলমান আজ তাদের জন্য শাশ্বত শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এই সূক্ষ্ম ইসলামী নির্দেশনা সম্পর্কে উদাসীন। ফলে তারা সময়নিষ্ঠতা ও সময়ানুবর্তিতার দীক্ষা গ্রহণ শুরু করেছে অন্যদের থেকে। যেন তাদের নিজেদের শাশ্বত শরীয়ত থেকে কখনও এই দীক্ষা তারা পায়নি, যার সর্বাগ্রে রয়েছে সালাতের মত সময়ানুবর্তিতার শিক্ষাদানকারী বিধান।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হল, সময় সম্পর্কে সচেতন হওয়া, উপযুক্ত সময়ে কাজের গুরুত্ব এবং সকল ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যা কিছু দান করেছেন তার মাঝে সবচে' দামী হল সময়। আর তা আলেম ও তালিবে ইলমের জীবনে বলতে গেলে তো– একই সাথে মূলধন ও লাভ

উভয়টিই। তাই কোন প্রাপ্তবয়স্ক, ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় সময়কে অবহেলায় ও অনর্থক কাজে নষ্ট করা, অনিয়ন্ত্রিত ও নিষ্ফল জীবন যাপন করা।

আর একারণেই আমি এই কিতাব সংকলন করেছি, যেন নিজেকে এবং নিজ উম্মাহর সন্তানদেরকে সময়ের সদ্ব্যবহারে উজ্জীবিত করতে পারি। আমার প্রত্যাশা কিতাবটিতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর মাঝে আমাদের পূর্বসূরীদের যে সকল কর্মসমৃদ্ধ তৎপরতা বিদ্যমান, তা দ্বারা আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব।

পরকথা হল, এটা হচ্ছে এই গ্রন্থের দশম মুদ্রণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ এই গ্রন্থখানিকে অভাবনীয় গ্রহণযোগ্যতা ও সমাদর দান করেছেন। ফলে পাঠক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং যারাই তার সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তারাই তার প্রশংসা করেছেন। সর্বোপরি বহুজন তা দ্বারা বেশ উপকৃত হয়েছে। (সকল প্রশংসা আল্লাহর। আর তিনিই সঠিকতা ও কল্যাণের পথপ্রদর্শক।)

বর্তমান মুদ্রণে আমি এমন কতিপয় ঘটনা সংযোজিত করেছি যা সর্বশ্রেণীর মানুষকে সময় সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করবে। আশা করি, জ্ঞানার্থী তালিবে ইলম এবং অন্যান্যরাও তা থেকে উপকৃত হবেন– যারা তাদের জীবনে সময়কে যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। আর তাদের নেক দু'আ দ্বারা আমিও উপকৃত হব এবং গণ্য হব ঐ সকল মানুষের কাতারে, যারা পুণ্যকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তো সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবক।

বিনীত

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

১৪০৬ হিজরী

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম দাতা ও দয়ালু

قال النبى صلى الله عليه وسلم : ما من يومٍ ينشقُّ فجرُه إلا ويُنادى : يا ابن آدم أنا خلقٌ جديد وعلى عملِك شهيدٌ، فتزوَّدْ منى فإنى لا أعود إلى يوم القيامة ،

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখনই কোন দিনের প্রভাত উদিত হয়, তখনই সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে, হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় সংগ্রহ কর। কেননা, কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না।

وفى روايةٍ أخرٰى : ما من يومٍ طلعتْ شمسُه إلا يقول : من استطاع أن يعمل فىَّ خيرا فليعملْه، فإنى غير مكرّر عليكم أبدا ....

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে–

যখনই কোন দিনের সূর্য উদিত হয়, তখনই সে (দিন) বলে, যে আমার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে কোন কল্যাণকর্ম করতে পারে সে যেন তা করে নেয়। কেননা আমাকে কখনও তোমাদের কাছে পুনরায় পাঠানো হবে না।

قال : الوزير الصالح يحيى بن هبيرة :

الوقتُ أنفسُ ما عُنيت بحفظه ✪ وأراه أسهلَ ما عليك يضيع

ইয়াহইয়া ইবন হুবায়রা বলেন,
যা কিছুর সংরক্ষণে তুমি সচেষ্ট হতে পার, তন্মধ্যে সময় হচ্ছে সবচে' মূল্যবান,
অথচ আমি দেখছি তা-ই সবচে' সহজে তোমার কাছে বরবাদ হচ্ছে।

সময়ের মূল্য

'সময়ের মূল্য' দু'টিমাত্র শব্দের ছোট্ট এই শিরোনাম। কিন্তু তাতে রয়েছে যেমন অর্থবহতা তেমনি বহুমাত্রিকতা। ফলে এ সম্পর্কিত আলোচনাতেও রয়েছে নানা বৈচিত্র ও বহুমুখিতা।

একজন দার্শনিকের কাছে সময়ের মূল্য যেরূপ একজন ব্যবসায়ীর কাছে তা সেরূপ নয়। একইভাবে একজন কৃষক, একজন কারিগর, একজন সৈনিক, একজন রাজনীতিবিদ, একজন যুবক, একজন বৃদ্ধ প্রত্যেকের কাছেই সময়ের মূল্য এবং প্রকৃতি ভিন্ন। তদ্রূপ একজন তালিবে ইলম ও আলিমের কাছে এর প্রকৃতি আরও ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

এই গ্রন্থে আমি শুধু আলিম ও তালিবে ইলমের কাছে 'সময়ের মূল্য' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর আমি তা করেছি এই প্রত্যাশায় যে, এই গ্রন্থখানি আমাদের তরুণ প্রত্যয়ী তালিবে ইলমদের মনোবল উজ্জীবিত করবে। কেননা আজকাল তালিবে ইলমদের মনোবল নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবং অধ্যবসায়ীদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষস্থল সুদূর পরাহত হয়ে পড়েছে। আর প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের অস্তিত্ব বিরল হয়ে পড়েছে। ফলে মেধা ও প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে, অলসতা ও নিষ্প্রভতার প্রসার ঘটেছে। যার দরুন আহলে ইলমের কর্মকাণ্ডে দুর্বলতা ও পশ্চাদমুখিতা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

সুতরাং আমি বলব, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিঅ'মাত অগণিত, অফুরন্ত। তার আধিক্যের যথার্থ অনুভব ও সঠিক উপলব্ধি মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়। তার কারণ হল, এসকল নিঅ'মাতের আধিক্য, অব্যাহততা, সহজলভ্যতা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দার প্রতি অনুগ্রহের নিরবচ্ছিন্নতা এবং সে বিষয়ে মানুষের উপলব্ধির তারতম্য। আর মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ○

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম : ৩৪)

নিঅ'মাতের প্রকারভেদ

আল্লাহ প্রদত্ত নিঅ'মাত (প্রধানত) দু'ভাগে বিভক্ত। (১) মূল, (২) শাখাগত। শাখা নিঅ'মাতের দৃষ্টান্ত হল– জ্ঞান, দেহকাঠামো এবং অর্থসম্পদে ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি। আর সুন্নত ও নফল ইবাদতসমূহের পাবন্দি। যেমন তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত, যিকির। আর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফিতরাতের সুন্নত এবং বিভিন্ন আমলী সুন্নত, যেমন পুরুষদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, সাক্ষাতকালে মুসাফাহা-করমর্দন, ডানপায়ে মসজিদে প্রবেশ করা, বামপায়ে বের হওয়া, চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ এবং এ জাতীয় বিভিন্ন সুন্নত, মুসতাহাব ও কতক ওয়াজিব বিষয়ের পাবন্দি। কেননা এসবই হল নিঅ'মাতের শাখা-প্রশাখা। আর নিঃসন্দেহে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ শাখা-প্রশাখা।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

আর মৌলিক নিঅ'মাতও অগণিত ও অসীম। সেগুলোর প্রধানতম হল, আল্লাহর প্রতি ও তাঁর পক্ষ থেকে আগত সবকিছুর প্রতি ঈমান এবং এসবের চাহিদানুযায়ী তিনি যা-যা নির্দেশ দিয়েছেন সেসবের উপর আমলের তাওফীক প্রাপ্তি।

তদ্রূপ সুস্থতা, রোগমুক্তি ও সুস্বাস্থ্যও অন্যতম মৌলিক নিঅ'মাত, যার কল্যাণে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, হৃদযন্ত্র এবং যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরাপদ ও কর্মক্ষম থাকে। আর তা (সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য) তো মানুষের সক্রিয়তা ও কর্মক্ষমতার অক্ষকেন্দ্র এবং নিজ অস্তিত্ব থেকে উপকৃত হওয়ার ভিত্তি-দণ্ড।

তদ্রূপ ইলমের নিঅ'মাতও অন্যতম মৌলিক নিঅ'মাত। কেননা তার উপর নির্ভরশীল মানবতার উন্নতি এবং তার দুনিয়া-আখিরাতের সুখ-সমৃদ্ধি।

যে কোন বিবেচনায় ইলম নিঃসন্দেহে বিরাট নিঅ'মাত। তা অর্জন করা যেমন নিঅ'মাত, তেমনি তা দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া এবং অন্যের উপকার করাও নিঅ'মাত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইলম পৌঁছে দেয়া এবং মানুষের মাঝে তার প্রসার ঘটানোও নিঅ'মাত।

এ ছাড়াও মৌলিক নিঅ'মাতের অনেক উদাহরণ রয়েছে। সময়ের মূল্যের প্রতি লক্ষ করে আমি তার আলোচনা প্রলম্বিত করছি না।

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিঅ'মাত

মানব জীবনে অন্যতম, মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নিঅ'মাত হল সময়ের নিঅ'মাত। এমনকি তার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল এই সময়; যার মূল্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমি গ্রন্থটি সংকলন করেছি। বিশেষতঃ আলিম ও তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে।

সময় হল মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্র ও জীবনের মূলধন। সময় হল মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন ধারণ এবং উপকার প্রদান ও উপকার গ্রহণের প্রাঙ্গণ। কুরআন করীম এই মৌলিক নিঅ'মাতের বিরাটত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং অন্যান্য নিঅ'মাতের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত এসেছে সময়ের মূল্য এবং তার সমুন্নত মর্যাদা ও বিরাট প্রভাবের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। বান্দাদের প্রতি এই বিরাট নিঅ'মাতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ ○ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ○ وَاٰتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ○

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। –সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪

দেখ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় নিঅ'মাতের সাথে রাত-দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সে দু'টিতো সময়ই-যার মূল্য সম্পর্কে এই কিতাবে আলোচনা চলছে। এই বিশ্বজগত– তার সূচনার শুরু থেকে সমাপ্তির শেষ পর্যন্ত– যাকে সঙ্গী করে চলছে ও চলবে।

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা এই মহা অনুগ্রহ 'সময়-সম্পদের' মূল্য বুঝাতে গিয়ে বহু আয়াতে এর উল্লেখ করেছেন। যেমন :

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন।

–সূরা নাহল : ১২

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ○

আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। আর রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আর আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। –সূরা বানী ইসরাঈল : ১২

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ

لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্য। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, সেজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা (প্রকৃতই নিষ্ঠার সাথে) শুধু তাঁরই ইবাদত কর।

–সূরা হা-মীম সেজদা : ৩৭

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

–সূরা আনআ'ম : ১৩

জীবনকাল বরবাদ করার কারণে কাফিরদের আল্লাহকর্তৃক ভর্ৎসনা

কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে কাফেররা যখন নিজেদের জীবনকালকে বরবাদ করলো, আল্লাহ প্রদত্ত সময়-সম্পদকে আল্লাহর নাফরমানিতে নষ্ট করল, দীর্ঘ জীবন পাওয়া সত্ত্বেও কুফর ত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করলো না, তখন আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কারমূলক সম্বোধন করে বলেন :

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ○ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ○

আমি কি তোমাদেরকে এতটা দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। সুতরাং শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। –(সূরা ফাতির : ৩৭)

চিন্তা-ভাবনা করা, উপদেশ গ্রহণ করা, ঈমান আনা ও সতর্ক হওয়ার জন্য 'তা'মীর' তথা দীর্ঘজীবন দানের কথাই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আর মানুষের বয়স তথা জীবন-কালকে মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে নবী ও সতর্ককারীগণের আগমনকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন।

কাতাদাহ র. বলেন :

اعلموا أن طولَ العمر حُجَّة، فنعوذ بالله أن نُعَيَّرَ بطول العمر

জেনে রাখ, দীর্ঘ জীবন কিন্তু (আমাদের বিরুদ্ধে) প্রমাণ। সুতরাং এমন দীর্ঘ জীবন থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, যার কারণে আমাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত)

(١) أعذَر الله عزَّ وجلَّ إلى امرءٍ أخَّر عمرهَ حتى بلَّغه ستّين سنةً –

(٢) مَنْ عمَّره الله ستِّين سنة فقد أعذَر إلَيه فى عُمره –

(১) যার জীবনকালকে আল্লাহ ষাট বছর দীর্ঘায়িত করেছেন তার জন্য তিনি অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাকে পূর্ণ হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে।)[৩]

(২) যাকে আল্লাহ ষাট বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছেন, জীবনকাল ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে তার অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।[৪]

আল্লাহ কর্তৃক সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ

পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলো ছাড়াও কুরআনে বিরাট এই নিঅ'মাত সম্পর্কে আরও বহু আয়াত রয়েছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে বহু সংখ্যক আয়াতে সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ করেছেন। রাত-দিন, পূর্বাহ্ন-অপরাহ্ন, প্রভাত ও গোধুলিকালের শপথ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। যথা :

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝

শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়। (সূরা লাইল : ১,২)

وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۝

শপথ রাতের, যখন তার অবসান হয়। শপথ দিনের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়। (সূরা মুদ্দাছ্ছির : ৩৩, ৩৪)

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

আমি শপথ করি অস্তরাগের ও রাতের এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে তার। (সূরা ইনশিকাক : ১৬, ১৭)

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝

শপথ ঊষার। শপথ দশ রাতের। (সূরা ফাজর : ১,২)

---

৩ সহীহ বুখারী : ১১ : ২৩৮

৪ মুসনাদে আহমদ : ২ : ৪১৭।

وَالضُّحٰى ○ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى ○

শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাতের, যখন তা হয় নিঝুম। (সূরা দুহা : ১,২)

وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○

মহাকালের[৫] শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আসর : ১-২)

বিশিষ্ট তাফসীরবিদ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা আসর এর ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ : "আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন, কারণ সময়ের মাঝেই আবর্তিত হয় ও অস্তিত্ব লাভ করে সকল বিস্ময়কর বিষয়। কেননা দুনিয়ার সবকিছু এবং সকল বিষয় এই সময়ের পরিধিতেই পরিবেষ্টিত। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ-দুর্দশা, সুস্থতা-অসুস্থতা, ধন-ঐশ্বর্য ও অভাব-দারিদ্র সবকিছুর প্রকাশ তো এই সময়ের মাঝেই হয়। তাছাড়া পৃথিবীর কোন কিছুই সময়ের মত মূল্যবান নয়।

ভেবে দেখ, যদি তুমি হাজার বছরও অনর্থক কাজে নষ্ট করে থাক আর জীবনের শেষ মুহূর্তে তাওবা করে বাকী সময় তাতে অবিচল থাকতে পার, তবে অনন্তকালের জন্য তুমি জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে গেলে। তাহলে তো তুমি বুঝতে পারলে, ঐ সময়টুকুর জীবনকালই তোমার জীবনে সবচে' মূল্যবান।

বস্তুত সময় হল আল্লাহপ্রদত্ত অন্যতম মৌলিক নিঅ'মাত। তাইতো আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, দিন এবং রাত হল মূল্যবান সুযোগ, বুঝে ও না-বুঝে মানুষ যা বরবাদ করে। তাছাড়া সার্বিক বিবেচনায় সময় তো স্থানের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন, তাই তিনি সময়ের শপথ করেছেন। কেননা সময় হল খাঁটি নিঅ'মাত, যাতে কোন খুঁত বা ত্রুটি নেই। ক্ষতিগ্রস্ত ও ত্রুটিযুক্ত হল মানুষ।"

দু'টি নি'অমাতের ক্ষেত্রে মানুষ প্রতারিত হয়

এতক্ষণ কোরআনের আলোকে সময় সম্পদের মূল্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হল এবং একথা বর্ণনা করা হল যে, সময় হল অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নিঅ'মাত। তবে হাদীছে এর বর্ণনা আরও স্পষ্ট,

---

[৫] কোন কোন মতে العصر, অর্থ আসর নামাযের সময়ের শপথ।

আরও উজ্জ্বল। যেমন , বুখারী, তিরমিযী ও ইবন মাজায় ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس : الصحَّة والفرَاغ —

দু'টি নিঅ'মাতের ব্যাপারে বহু মানুষ প্রতারিত হয়, (সে দু'টি হল) সুস্থতা ও অবসর।

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হাদীছে غبن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল– ঠকা, প্রতারিত হওয়া। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন জিনিস অধিক বা দ্বিগুণ দামে কিনলে অথবা ন্যায্য মূল্যের কমে বিক্রি করে ঠকলে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হাদীছে এই শব্দটি উপমারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যে শারীরিকভাবে সুস্থ এবং বিশেষ কোন কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরকালীন কল্যাণে তেমন কিছু করল না, বা করতে পারল না সেও ঠিক বেচা-কেনায় প্রতারিত ব্যক্তির মতই প্রতারিত হল। (ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে) বেশীরভাগ মানুষই (ব্যাধিমুক্ত ও কর্মশূন্য) সময়ের সদ্ব্যবহার করতে ও তা থেকে উপকৃত হতে পারে না; বরং তা অপাত্রে ব্যয় করে। ফলে তা শুভ না হয়ে অশুভ হয়ে যায়, নিঅ'মাত না হয়ে আপদ হয়ে দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে যারা এই সুযোগ ও নিঅ'মাতগুলোকে কাজে লাগাতে এবং সেগুলো নিংড়ে তার নির্যাস আস্বাদন করতে পারে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর হয়ে যায়।

ইবনুল জাওযী র. বলেন, কখনো মানুষ সুস্থ থাকে, কিন্তু অবসর থাকে না; জীবিকা নির্বাহে থাকে ব্যস্ত। আবার কখনো সে অবসর থাকে, কিন্তু সুস্থ থাকে না; অসুস্থতায় হয়ে পড়ে শয্যাশ্রিত। যদি কখনো তার মাঝে উভয়টি একত্র হয়, কিন্তু আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে অলসতা তার উপর প্রবল হয় তাহলে তাকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত ছাড়া আর কী-ই-বা বলা হবে!

মোটকথা, দুনিয়া হল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র ও ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে যা আবাদ করা হবে তার ফসল আখেরাতে পাওয়া যাবে। এখানে যে ব্যবসা করা হবে তার লাভ অবশ্যই পরকালে ভোগ করা যাবে। সুতরাং যে সুস্থতা ও অবসরকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যবহার করবে সে হবে ঈর্ষার পাত্র। আর যে ব্যক্তি তা ব্যবহার করবে আল্লাহর নাফরমানিতে সেই হল প্রতারিত। কেননা অবসরের পর ব্যস্ততা এবং সুস্থতার পর

অসুস্থতা আসে। আর যদি অন্য কোন অসুস্থতা নাও দেখা দেয়, তবুও অবশেষে মৃত্যুসংবাদবাহী বার্ধক্য তো দেখা দেবেই। সুতরাং সময় থাকতেই সতর্ক হও- বন্ধু!

সময়ের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ তো জীবননাশী

ইমাম ইবনুল কায়্যিম র. তার مدارج السالكين নামক গ্রন্থে গায়রত তথা আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে সময়ের ব্যাপারে গায়রত সম্পর্কে বলেন, 'হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপারে যে গায়রত বা মর্যাদাবোধ তা হল বিনাশী। কেননা সময় দ্রুত বহমান, আপোষহীনভাবে অগ্রসরমান।

'আবিদের কাছে সময় ইবাদত-বন্দেগী ও ওয়াযীফা আদায়ের জন্য, মুরীদের কাছে সময় আল্লাহমুখিতা এবং তাতে সর্বান্তঃকরণে আত্মসমাহিত হওয়ার জন্য। সুতরাং সময় তার কাছে মহামূল্যবান বস্তু। উল্লিখিত আমল ব্যতীত সময় হাতছাড়া হওয়া তার আত্মমর্যাদাকে আঘাত করে। কেননা যদি একবার তা হাতছাড়া হয়ে যায়। তাহলে তার ক্ষতিপূরণ কখনোই সম্ভব নয়। কেননা পরবর্তী সময় তো তার বিশেষ কর্তব্যকর্মের জন্য নির্ধারিত।

সুতরাং কোন সময় যখন তার হাতছাড়া হয়ে যাবে তখন আর কিছুতেই তার নাগাল পাওয়ার কোন উপায় থাকে না। তখন ছুটে যাওয়া আমলের 'কাযা' আদায়ের চেয়ে ঐ সময়ে নির্ধারিত কাজটুকু করাইতো বাঞ্ছনীয়। এজন্যইতো হাতছাড়া হওয়া সময়ের জন্য যে গায়রত, তাকে বিনাশী বলা হয়েছে। কারণ, তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া জীবননাশের সদৃশ। কেননা, হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ-অনুশোচনা আত্মঘাতী ও বিনাশী। বিশেষতঃ আক্ষেপকারী যখন বুঝতে পারে যে, ক্ষতিপূরণের বা ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার কোন পথ নেই। কেননা কোন কিছু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য আত্মশ্লাঘাবোধ অন্য কিছু হাতছাড়া করার সমতুল্য। যেমন বলা হয়,

الاشتغالُ بالندَم على الوقت الفائت تضييعٌ للوقتِ الحاضرِ —

অর্থ : হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সময়ের জন্য অনুতাপ-অনুশোচনায় লিপ্ত হওয়াও তো বর্তমান সময়কে নষ্ট করা।

এ কারণেই বলা হয়,

الوقتُ كالسَّيف إن لم تقطَعْه قطعَك ـــ

অর্থ : সময় হল তরবারির মত, তুমি যদি তাকে না কাট, তবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে।[৬]

সময় সদাবহমান

সময় (সত্তাগতভাবেই) সদা বহমান ও অপসৃয়মান। আর তার প্রতিটি মুহূর্ত বিদ্যুৎ চমকের মত; বর্তমানের আকাশে এই জ্বলে ওঠে, তারপর নিভে যায়; হারিয়ে যায় অতীতের অজানা ঠিকানায়। সুতরাং যদি কেউ সময়ের ব্যাপারে (অন্যভাষায়, তার নিজের ব্যাপারে) গাফেল থাকে তবে সময় তো আর তার জন্য থেমে থাকবে না, তা তো আপন গতিতে– নদী তরঙ্গের মত চলতেই থাকবে, ফলে তার লোকসান ও না পাওয়ার ফিরিস্তি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলবে এবং দুঃখ-বেদনা ও আফসোস-অনুশোচনা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকবে।

একটু ভেবে দেখ, যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব নেয়া হবে আর এসব লোকসান ও না পাওয়ার পরিধি ও পরিমাণ সম্পর্কে সে অবগত হবে তখন তার কী অবস্থা হবে! সে তখন লোকসান পুষিয়ে নিতে চাইবে, আবার ফিরে আসার আবেদন জানাবে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার বা অতীত লোকসান পুষিয়ে নেয়ার কোন উপায় থাকবে না। অতীতে ফিরে আসার কোন আবেদন-নিবেদনই তার গৃহীত হবে না।

আর এটাইতো স্বাভাবিক; গতকালটাকে কি তুমি আজকের নতুন দিনে ফিরে পাবে! বা ফিরে পাওয়ার আশা করতে পার!! আল্লাহ তা'আলার বাণী তো এরই প্রমাণ বহন করে ঃ

---

৬ **ব্যাখ্যা :** ইবন আবী জামরাহ র. তার 'বাহজাতুন নুফুস' নামক গ্রন্থে বলেন, একথার অর্থ হল, তুমি সময়কে কাজ দ্বারা কর্তন (অতিবাহিত) কর, যেন সে তোমাকে কাজের আশ্বাস দিয়ে নিষ্কর্মা ও নিঃশেষ করে দিতে না পারে।

এছাড়া এ বাক্যের এ অর্থও করা যায়, যদি তুমি সময়কে কাজে লাগানো এবং সময় থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সজাগ না হও তাহলে তুমি হবে তরবারির আঘাতের সম্মুখীন ব্যক্তির ন্যায়। কেননা সে যদি তা থেকে আত্মরক্ষা এবং তা প্রতিহত করার জন্য সজাগ না হয় তাহলে তরবারির আঘাত তাকে শেষ করে দেবে। এ কারণেই জনৈক আরব কবি বলেন–

وكن صارمًا كالوقت فالمقتُ في عسى ✪ وخلِّ لَعلَّ فهي أكبَرُ علَّة

সময়ের ন্যায় অপ্রতিহত হও, আর আশ্বাস তো অপ্রিয় বিষয়, তাই করব করছি থেকে বেঁচে থাক, কেননা তা সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাধি।

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ○

অর্থ : এবং তারা বলবে, আমরা তাতে ঈমান আনলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান থেকে তারা এর নাগাল পাবে কীভাবে? (সূরা সা'বা : ৫২)

এই আয়াতে মূলত কাফেরদের পরকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তারা ঈমানের নাগাল পায়নি। কুফুরী থেকে তওবার সুযোগও তাদের হয়নি। অথচ দুনিয়াই হল এ দু'য়ের প্রকৃত স্থান। কিন্তু তারা এই সুযোগকে হাতছাড়া করেছে। দুনিয়ার হায়াতকে বেঈমানীতে খুইয়ে বসেছে। তবে আজ তারা দুনিয়া থেকে এত দূরের স্থানে, হাশরের ময়দানে-কীভাবে এর নাগাল পাবে?

ঠিক তেমনি যারা আজকের কাজে উদাসীন থেকে দিনটাকে খোয়াবে আগামীতে কিংবা কাল হাশরে কখনোই এ সময় তাদের কাছে ফিরে আসবে না, এর দেখা আর তারা পাবে না। কবি তো তা-ই বলেছেন ছন্দের মালা গেঁথে–

فيا حسرات ! ما إلى ردِّ مثلها ✪ سبيل ، ولو رُدَّت لهان الخسْرُ

অর্থ : হায় আফসোস! তার অনুরূপ তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, যদি তার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হতো, দুঃখ-যাতনা কিছুটা হলেও লাঘব হতো।

প্রতিটি মুহূর্ত খুব দ্রুত অতিবাহিত হয়; মেঘমালার চেয়েও দ্রুত। সে চলে যায়, ফিরে আসে না, কখনও আর তার দেখা মেলে না। যখন সে চলে যায় তার মধ্যকার সবকিছুকে নিয়েই যায়। কিন্তু ফিরে আসে শুধু এর পরিণাম ও পরিণতি।

সুতরাং হে বন্ধু! এবার তুমিই নির্ধারণ করে নাও, এই সময় থেকে তুমি কী পরিণাম চাও। আর এটা নির্ধারণ করে নিতে হবে সময় উপস্থিত থাকতেই। তার মূল্যায়নে যেমন সুফল আসবে তেমনি অবমূল্যায়নে আসবে কুফল। পরিণাম-ভাল কি মন্দ– ফিরে তা আসবেই, তা রোধের কোন ব্যবস্থা নেই। দেখ আল্লাহ কত সুন্দরভাবে এই বাস্তবতার চিত্র দু'টি আয়াতে তুলে ধরেছেন।

জান্নাতবাসী সৌভাগ্যবানদের বলা হবে–

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○

অর্থ : (তাদেরকে বলা হবে,) 'পানাহার কর তৃপ্তি সহকারে, তোমরা অতীতে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।' (সূরা : হা'ক্বাহ : ২৪)

আর জাহান্নামী দুর্ভাগাদের বলা হবে,

ذٰلِكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ○

অর্থ : এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা দম্ভ করতে। (সূরা গাফির : ৭৫)

সময় তরবারির ন্যায়

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম আরও বলেন, “সবচে’ মূল্যবান ও কল্যাণকর ভাবনা হল আল্লাহ ও আখেরাতের ভাবনা। আল্লাহর জন্য ভাবনা অনেক প্রকার হতে পারে, যেমন .... পঞ্চম প্রকার, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তা পালনে মনোবল ও দৃঢ় ইচ্ছার সমন্বয় করা।

‘আরেফ’ তথা দূরদর্শী তো সেই যে তার সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করে। আর সময়কে নষ্ট করা মানে তো হল তার মধ্যকার সকল কল্যাণ হাতছাড়া করা। ছন্দের ভাষায়–

‘ভাল ও কল্যাণ যত, সময় থেকেই সৃষ্ট।
পায় না দেখা কভু তার, যে করে তা নষ্ট।’

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, দীর্ঘদিন আমি সুফি-সাধকদের সংস্পর্শে থেকেছি। এ সময়ে তাদের থেকে শুধু দু’টি বিষয়ই অর্জন করতে পেরেছি।

এক. الوقتُ سيفٌ فإنْ لم تقطعْه قطَعك

অর্থ : সময় হল তরবারি; তুমি যদি তাকে না কাট, সে তোমাকে কেটে ফেলবে।

দুই. نفسُك إن شغلتها بالحق وإلاَّ شغلتكَ بالباطل

অর্থ : তুমি যদি নিজেকে সত্য ও ন্যায় কর্মে ব্যস্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে অসৎ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত করবে।

শুধু আল্লাহর জন্য ব্যয়িত সময়টুকুই প্রকৃত জীবন

প্রকৃতপক্ষে জীবন তো খণ্ড খণ্ড সময়ের সমষ্টি বৈ কিছু নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ‘সময়ই জীবন’। আর পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের মূলও এই সময়ই। হোক তা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জান্নাতী জীবন কিংবা দুঃখ-যাতনার জাহান্নামী জীবন।

সময়ের মূল্যায়ন করে ও আল্লাহর রাহে ব্যয় করে যেমন জান্নাত লাভের আশা করা যায়, তেমনি এর অবমূল্যায়ন ও অপাত্রে ব্যয়ের কারণে– আল্লাহ মাফ করুন– জাহান্নামের ফয়সালার আশঙ্কাও রয়ে যায়।

আর আল্লাহ তা'আলা তো মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। সুতরাং বলা যায়, যে সময়টুকু মানুষ আল্লাহর জন্য– তাঁর আদেশ পালনে ও নিষেধ থেকে নিজেকে দমনে ব্যয় করে তাই তার জীবন, তথা মানব জীবন বলে গণ্য হবে। আর বাকী সময়টা, যতই দীর্ঘ জীবন সে লাভ করুক না কেন– সেটা পশুত্বের জীবন। যদি কেউ তার সময় ও জীবনকে উদাসীনতা, প্রবৃত্তি পূজা ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে কাটায় তবে বলা যায়– তার জীবনের ঐ সময়টুকুই সবচে' ভাল কাটল, যেটুকু সে ঘুমে ও কর্মহীনতায় কাটাল। এ ধরনের মানুষের জন্য জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। বিষয়টি বোঝার স্বার্থে একটি উদাহরণ পেশ করা যায়, যখন কোন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় তখন নামাযের ঐ অংশটুকুই তার উপকারে আসে যেটুকু সে সজ্ঞানে আদায় করে। আর সেটুকুই নামায বলে বিবেচিত হয়।

তবে কি আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি না, যে সময়টা মানুষ আল্লাহর রাহে, তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে অতিবাহিত করে সে অংশটুকুই প্রকৃত জীবন; সেটাই তার যথার্থ আয়ুষ্কাল!

তাই আমাদের পূর্বসূরীগণ এবং তাদের সার্থক উত্তরসূরীগণ সময় সংরক্ষণ এবং পুণ্য ও ভাল কাজে তা আতিবাহিত করণে অত্যন্ত আগ্রহী; বরং বলা ভাল, মরণপণ চেষ্টায় রত ছিলেন। এক্ষেত্রে আলেম ও আবেদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রতিটি ঘণ্টা ও মিনিট সংরক্ষণে তাঁরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করে যেতেন। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে তারা যেন ছুটে চলতেন। জীবনের প্রতি মমতা ও সময়ের ব্যাপারে 'কৃপণতার' কারণে সর্বদা তারা সজাগ-সতর্ক থাকতেন, যেন একটি মুহূর্তও অনর্থক হাতছাড়া না হয়ে যায়।

সূর্যকে ধরে রাখ আমি তোমার সাথে কথা বলি

যুহ্দ ও দুনিয়াবিমুখতায় প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, আমের ইবন আবদে কায়ছ র.। একবার এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, আমাকে একটু সময় দিন; আমি কিছু কথা বলব। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সূর্যকে থামিয়ে রাখ।'

তাঁর কথার মর্ম হল, তুমি যদি সূর্যের গতিকে রোধ করতে পার, সময়ের প্রবাহকে থামিয়ে দিতে পার তবেই আমি তোমার সাথে কথা বলব।

কেননা, সময় সদাবহমান। কখনও তা ফিরে আসে না। আর সামনের প্রতিটি সময়ই তো কোন না কোন কাজের জন্য নির্ধারিত। তাই তোমার সাথে কথা বলে যে সময়টা আমার চলে যাবে, যে ক্ষতি আমার হয়ে যাবে তা কখনো পূরণ করা যাবে না।

সময়ের ব্যাপারে সাহাবী-তাবেয়ীদের উক্তি

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন–

ما ندمتُ على شيءٍ ندمى على يومٍ غربتْ شمسُه، نقصَ فيه أجلِى و لمْ يزدْ فيه عملى —

আমার সবচে' বেশী আফসোস ও পরিতাপ হয়– এমন দিনের জন্য, যে দিনের সূর্য ডুবে গেল, আমার দুনিয়ার হায়াত কমে গেল, অথচ সেদিনে আমার নেক আমল বৃদ্ধি পেল না।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

খিলাফতে রাশেদার সার্থক অনুসারী উমর ইবন আবদুল আযীয র. বলেন-

إن الليل والنهار يعملان فيك فاعملْ فيهما —

রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে চলছে, (অর্থাৎ, তোমার চলা-ফেরা ও আচার-অভ্যাসে কোন না কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করে চলছে।) তাই তুমিও তাদের মাঝে কাজ করে যাও, (অর্থাৎ, কোন না কোন পুণ্য ও ভাল কাজে দিন-রাতকে অতিবাহিত কর।)

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী র. বলেন–

يا ابنَ آدمَ! إنما أنتَ أيَّام، فإذا ذهبَ يومٌ ذهبَ بعضُك —

হে আদম সন্তান! তুমি তো কতক দিনের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং যখন একটি দিন অতিবাহিত হল তখন তোমার জীবনের একাংশ হারিয়ে গেল।

তিনি আরও বলেন–

أدركتُ أقوامًا كانوا على أوقاتِهم أشدَّ منكم حِرصًا على دَرَاهمكم ودنانيركم —

আমি এমন অনেক ব্যক্তির সাহচর্য পেয়েছি, সময় সংরক্ষণে যাদের আগ্রহ, তোমাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণের আগ্রহের চেয়ে বেশী ছিল।

মৃত্যু-সংবাদেও যাঁর অবস্থা অপরিবর্তিত

বিদগ্ধ মুহাদ্দিছ ও ইতিহাসবিদ হাফেয যাহাবী তাঁর تذكرة الحفاظ (তাযকিরাতুল হুফফায) গ্রন্থে হাম্মাদ ইবন সালামার[৭] জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, তাঁর শাগরেদ আবদুর রহমান ইবন মাহদী বলেন, 'হাম্মাদ ইবন সালামাকে যদি জানিয়ে দেয়া হয় আপনি তো আগামীকাল মৃত্যু বরণ করবেন, তবুও তার আমলে কোন পরিবর্তন আসবে না, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। কারণ তিনি সর্বদা এতটাই আমলে মশগুল থাকেন যে, অত্যাসন্ন মৃত্যুর কথায় প্রভাবিত হয়েও এরচে' বেশী আমল করা সম্ভব ছিল না।'

মূসা ইবন ইসমাঈল নামক জনৈক মনীষী বলেন, যদি বলি- হাম্মাদকে আমি কখনো হাসতে দেখিনি, তবে তা অত্যুক্তি হবে না। তিনি সর্বদাই হাদীছ বর্ণনা বা অধ্যয়নে কিংবা তাসবীহ পাঠ বা নামায আদায়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর দিন-রাত এসব কাজেই ভাগ করা ছিল।

ইউনুস আল মুআদ্দিব বলেন, হাম্মাদ ইবন সালামা নামায পড়তে পড়তে (অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায়) ইন্তেকাল করেন।

সবচে' অসহনীয় সময় হল খাওয়ার সময়

খলীল ইবন আহমদ আল ফারাহীদী ছিলেন বিদগ্ধ ভাষাবিদ। তিনি ১০০ হিজরীতে বসরা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইন্তেকাল করেন ১৭০ হিজরীতে। তাঁর সম্পর্কে আবু হেলাল আসকারী র. এক গ্রন্থে লিখেন যে, খলীল ইবন আহমদ র. বলতেন-

أثقلُ السَّاعاتِ عليَّ ساعةٌ آكُلُ فيها —

আমার কাছে সবচে' অসহনীয় সময় হল আমার খাওয়ার সময়। অর্থাৎ, আহার গ্রহণের সময় বাধ্য হয়েই আমাকে জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। যদি এর (পানাহারের) আবশ্যকতা না থাকত তবে এক

---

[৭] তাঁর জন্ম (বসরা নগরীতে) ৯১ হিজরীতে আর মৃত্যু ১৬৭ হিজরীতে।

মুহূর্তের জন্যও আমি এই ইলম চর্চা-যা আমার দেহের ও মনের খোরাক যোগায় এবং হৃদয়ে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়– তা থেকে বিমুখ হতাম না। আল্লাহু আকবার! ইলমের জন্য জীবন উৎসর্গের এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে কি! সময়ের সদ্ব্যবহারের এমন চিত্র কেউ আরেকটি দেখাতে পারবে কি!

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ইলমী আলোচনা

ইমাম আবু ইউসুফ র., যিনি ছিলেন ইমাম আযম আবু হানীফা র. এর বিশিষ্টতম শাগরেদ এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং মতাদর্শ ও মাযহাবের প্রচার-প্রসারকারী। সাথে সাথে তিনি ছিলেন আব্বাসীয় খলীফা মাহদী, হাদী, ও রশীদ এই তিনজনের আমলে প্রধান বিচারপতি। তিনিই সর্ব প্রথম قاضى القضاة (প্রধান বিচারপতি) উপাধিতে ভূষিত হন। তাকে قاضى قضاة الدنيا (আন্তর্জাতিক প্রধান বিচারপতি)ও বলা হয়। তাঁর জন্ম ১১৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৮২ হিজরীতে।

তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উপনীত তখনও তিনি তাঁর কয়েকজন সাক্ষাৎপ্রার্থী ও শুশ্রূষাকারীর সাথে ফিকহী মাসআলা আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। সুতরাং একথা বলা অত্যুক্তি হবে না, জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইলম চর্চা এবং এর মাধ্যমে মানুষের উপকার চিন্তায় মশগুল ছিলেন।

তাঁর শাগরেদ ইবরাহীম বিন জাররাহ কুফী– তিনিও বিচারক ছিলেন– তিনি বলেন, আমার উস্তায আবু ইউসুফ র. যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আমি তাকে দেখতে গেলাম। রোগের তীব্রতায় তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো, তিনি আমাকে দেখে বললেন, ইবরাহীম! এই মাসআলার ব্যাপারে তোমার কী মতামত?

আমি বললাম, হযরত, এই অবস্থায় ....!

তখন তিনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই, আমরা আলোচনা করে যাই, আমাদের উত্তরসূরী যারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য যেন তা সহজ হয়। এরপর তিনি বললেন, হজ্বে কীভাবে রা'মী (শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপ) করা উত্তম; পায়ে হেঁটে না কি আরোহণ করে?

–আরোহী অবস্থায় ....।

–তুমি ঠিক বলনি।

–তবে কি হেঁটে?
–না, ঠিক হয় নি।
–তাহলে আপনিই বলুন।
–যেখানে দু'আর জন্য দাঁড়াবে সেখানে হেঁটে রা'মী করা উত্তম। আর যেখানে দু'আ করবে না সেখানে আরোহী অবস্থায় উত্তম।

এতটুকু কথার পর আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে গেলাম। কারণ, আমার আশংকা হচ্ছিল, আমি যতক্ষণ থাকব তিনি আলোচনা করতেই থাকবেন। আর এতে তাঁর কষ্ট বাড়তেই থাকবে। এরপর আমি তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর গৃহদ্বার অতিক্রম করতে না করতেই তিনি আমাদের সবাইকে চিরবিদায় জানালেন।[৮]

ইলমের সাথে কেমন তাঁর সম্পর্ক?

ইবন হাজার আসকালানী র. তাঁর এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে[৯] ইমাম শাফেয়ী রহ. সম্পর্কে লিখেন যে, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস শাফেয়ী রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হল– ইলমের প্রতি আপনার আগ্রহ কেমন?

তিনি বললেন, যখন আমি কোন নতুন শব্দ শুনি তখন আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কামনা করে, যদি তাদের প্রত্যেকের অগণিত শ্রবণেন্দ্রিয় থাকত; আর এগুলোর মাধ্যমে তারা স্বতন্ত্রভাবে শব্দ ও শব্দের অর্থ উপলব্ধি করতে পারত, এর তৃপ্তি ও স্বাদ আস্বাদন করতে পারত, যেমন আমার কর্ণদ্বয় করে থাকে।

–ইলম অন্বেষণের প্রতি আপনার আসক্তি কেমন?
–ধন-সম্পদের প্রতি কৃপণের আসক্তি যেমন।
–ইলমের জন্য আপনার তলব কেমন?
–একমাত্র সন্তানহারা জননীর মত।

হ্যাঁ পাঠক! ইলমের প্রতি এমন গভীর আগ্রহ ও আসক্তিই তাঁর মাঝে এমন মেধা ও প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টি করেছিল, যার স্বীকৃতি আজও দুনিয়া দিয়ে যাচ্ছে এবং –ইনশাআল্লাহ– কেয়ামত পর্যন্ত দিয়ে যাবে।

---

[৮] এ যেন طلب العلم من المَهْد الى اللحد (জ্ঞান অন্বেষণ তো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত) একথার বাস্তব চিত্র। (জেনে রাখা ভাল, এ উক্তিটি হাদীছ নয়।)

[৯] توالى التأنيس بمعالى محمد بن ادريس পৃষ্ঠা : ১০৫

সন্তানের কাফন-দাফনের দায়িত্বভার অন্যের হাতে অর্পণ

ইমাম আবু ইউসুফ র. সতের বছর, (মতান্তরে ঊনত্রিশ বছর) ইমাম আবু হানীফার সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও তাঁর সঙ্গ ছাড়া ফজর নামায আদায় করেছেন, এমনটি হয়নি। ঈদুল ফিতর বল বা ঈদুল আযহা, সব সময় তাঁর একই অবস্থা। অসুস্থতা ছাড়া আর কোন কিছুকে তিনি উস্তায থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে ওযর মনে করেননি। এছাড়া কখনো তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকেননি।

ইলমের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মগ্নতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "(একবার) আমার এক সন্তান মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা র. এর কোন দরস কিংবা কোন আলোচনা থেকে আমি বঞ্চিত হব, আর সেজন্য আজীবন আমি অনুতাপ ও অনুশোচনাদগ্ধ হব এই আশংকায় আমি সন্তানের দাফন-কাফনে শরীক হইনি। বরং এর দায়-দায়িত্ব নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের হাতে ন্যস্ত করেছি।"

চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন যিনি

ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাছান শায়বানী র., যিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফা র. এর অন্যতম প্রসিদ্ধ শাগরেদ এবং তাঁর মাযহাবের প্রথম রচয়িতা। তিনি ১৩২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইলম অন্বেষণের তাগাদায় তিনি রাতে খুবই অল্প ঘুমাতেন। সব সময় বিভিন্ন কিতাব কাছে রাখতেন। যখন একটি পড়তে পড়তে একঘেয়েমি বোধ করতেন তখন অন্যটি শুরু করতেন। আর তিনি চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন এবং বলতেন– 'ঘুম তো উষ্ণতা থেকেই আসে। তাই শীতলতার মাধ্যমেই তাকে প্রতিহত করতে হয়।'

কলমের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা!

ইছাম ইবন ইউসুফ রহ. (মৃত্যু ২১৫ হিজরী) ছিলেন শীর্ষস্থানীয় হানাফী ফকীহ এবং বল্‌খ শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ। ইলমের সকল মূল্যবান রত্ন তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণের জন্য (সে যুগে) তিনি এক দীনার (বা স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে একটি কলম ক্রয় করেছিলেন।

আল্লামা তাসকুবরী র. তাঁর "মাফাতিহুস্‌ সা'আদাহ" গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখের পর লিখেন– 'জীবন তো খুবই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত। অথচ ইলমের

পরিধি হল অসীম ও অপরিমিত, তার অবগতিও তো মানুষের সাধ্যাতীত। তাই প্রত্যেক তালিবে ইলমের উচিৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা। একটি মুহূর্তকেও নষ্ট না করা। রাত ও রাতের নির্জনতাকে এবং একাকিত্বের সময়গুলোকে গণীমত মনে করা। জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞজনদের সান্নিধ্য এবং তাদের থেকে জ্ঞান-রত্ন আহরণের সুযোগকে নিজেদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ জ্ঞান করা, আর এগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন করা। কারণ, সুযোগ বারবার আসে না, যা কিছু হাতছাড়া হয়ে যায় তার সব ফিরে পাওয়া যায় না। কবি খুব সুন্দর বলেছেন–

ولستُ بمدركٍ ما فاتَ منّى ✪ بلهفَ ولا بليتَ ولا لو أنى

যতই হোক আফসোস-দীর্ঘশ্বাস, কিংবা হোক যত হা হুতাশ,
একবার যদি হয় হাতছাড়া, তবে তার ফিরে আসার নেই কোন আশ্বাস।

৩০ বছর অন্যের হাতে খাদ্য গ্রহণ

হাফেয যাহাবী রহ. তাঁর গ্রন্থ 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'য় হাদীছ শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত দুই ইমাম, বুখারী ও মুসলিমের উস্তায প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ উবাইদ বিন ইয়াঈশের র. (মৃত্যু : ২২৯ হিজরীর রমযান মাসে) জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় তিনি ছিলেন হাফেয ও হুজ্জাত। সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি নিজের অসাধারণ সচেতনতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমার জীবনে একাধারে ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে যখন নিজ হাতে রাতের খাবার খাওয়ার সুযোগ হয় নি। এ সময় আমি হাদীছ লিখে যেতাম আর আমার বোন আমার মুখে খাবার তুলে দিতেন।

মীরাছরূপে প্রাপ্ত দশ লাখ দেরহাম ইলম অর্জনে ব্যয়

ইয়াহইয়া ইবন মাঈন র. ছিলেন শীর্ষস্থানীয় বিদগ্ধ মুহাদ্দিছ। হাদীছ শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম ও পথিকৃতগণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাকে شيخ المحدثين উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তিনি ১৫৮ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন। তাঁর পিতা মাঈন ছিলেন খলীফার অন্যতম রেজিস্ট্রি অফিসার। পুত্রের জন্য তিনি দশ লাখ দিরহাম রেখে যান। ইয়াহইয়া এর

সবটুকুই ইলম অর্জনের পথে ব্যয় করেন। শেষ পর্যায়ে এমন অবস্থা হল যে, পরার মত জুতা তার অবশিষ্ট ছিল না।

তিনি যখন দশ বছরের ছোট্ট বালক, তখন থেকেই হাদীছ লিখতে শুরু করেন। আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, 'আজ মানুষের মাঝে যে হাদীছ চর্চা দেখতে পাওয়া যায় তার কৃতিত্ব ইয়াহইয়া বিন মাঈনের।

আব্দুল্লাহ ইবন রূমীর সামনে একথা বলা হল যে, কোন কোন মুহাদ্দিছকে ইবন মাঈন থেকে হাদীছ বর্ণনা কালে বলতে শোনা যায়, حدَّثني من لم تطلعْ الشمسُ على أكبر منه (এমন ব্যক্তি আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যার চেয়ে বড় কোন হাদীছ বিশারদের উপর সূর্য উদিত হয়নি।) তখন তিনি বলেন, এতে আর আশ্চর্যের কী হল? আমি তো ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি, 'তাঁর মত বড় মানুষ আমি আর দেখিনি। তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি যত হাদীছ লিখেছেন আদম সন্তানদের কেউ এত হাদীছ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।' ইবন মাঈন নিজেই বলেছেন, এই হাতে আমি প্রায় দশ লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।

ইমাম যাহাবী র. একথা ব্যাখ্যা করে বলেন : এই সংখ্যাটি হাদীছের তাকরার ও পুনরুক্তি বিবেচনায়। কেননা অন্যত্র তিনি বলেছেন, একটি হাদীছকে যদি আমি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে কমপক্ষে পঞ্চাশ বার না শুনি এবং না লিখি তবে হাদীছরূপে আমার সাথে তার পরিচিতিই ঘটে না।

আহমদ ইবন হাম্বল র. বলেন, ইয়াহইয়া ইবন মাঈন যা হাদীছ বলে জানেন না বা স্বীকৃতি দেন না তা হাদীছই নয়। মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা, পঙ্কিলতা ও বিকৃতি থেকে হাদীছ শাস্ত্রকে রক্ষার জন্যই আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের জন্য ইয়াহইয়া বিন মাঈন এমন এক রীতি নির্ধারণ করে দেন, যুগে যুগে যার অনুসরণের মাধ্যমে মুহাদ্দিছগণ হাদীছ ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করেছেন।

তিনি বলেন–

إذا كتبتَ فقمّشْ وإذا حدَّثتَ ففتّشْ —

যখন তুমি হাদীছ লিখবে তখন (যা কিছু শোন) সবই লিখবে, কিন্তু যখন হাদীছ বর্ণনা করবে তখন গভীরভাবে তা যাচাই বাছাই করবে।

তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি একশ' চৌদ্দটি তাক ও চারটি বড় মটকা[১০] বোঝাই কিতাব রেখে যান।

---

[১০] সে যুগে মানুষ তাক বা বড় মটকাতে কিতাব/পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতো।

রাসূলের গোসলের খাটিয়ায় যাঁর শেষ গোসল হল

যখনই তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা যেতেন, মদীনার পথে যেতেন। আর ফিরেও আসতেন মদীনার পথেই। ২৩৩ হিজরীর জিলক্বদের শেষ দিকে হজ্বের সফরে মদীনায় পৌঁছে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৩ তারিখ রাতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। যখন তাঁর মৃত্যুর খবর জানাজানি হল তখন বনু হাশিমের লোকেরা তাঁর গোসলের জন্য ঐ খাটিয়া বের করে দিলেন যার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দেয়া হয়েছিল। অবশেষে তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি এমন ব্যক্তি যিনি হাদীছে রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিকৃতি, আবিলতা ও পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করেছেন।

আচ্ছা বন্ধু! এমন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অধিকারী তিনি কীভাবে হলেন? কীভাবে তাঁর মাঝে এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং মেহনত ও মোজাহাদার সন্নিবেশ ঘটল?

উত্তর একটিই সময়ের (সদ্ব্যবহারের) প্রতি সচেতনতার মাধ্যমে; ইলম অন্বেষণে অত্যাগ্রহের কারণে।

তাঁর জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনাই এর প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আর তা হল– ইমাম তিরমিযী র. আবদ ইবন হুমায়দের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবন মালিক র. বলেন–

إن النبى صلى الله عليه وسلّم خرج من بيته– وهو فى مرض موته– يتّكئ على أسامة بن زيد، وعليه ثوب قِطرىّ، قد توشّح به– فصلى بهم–

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর অন্তিম ব্যাধিতে আক্রান্ত, তখন উসামা ইবন যায়দ রা. এর উপর ভর করে কামরা থেকে বের হলেন। আর তাঁর গায়ে ছিল একটি নকশী ইয়ামানী কাপড়। এরপর তিনি লোকদের নামায পড়ালেন।

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীছ রেওয়ায়েতের পর বলেন, আমার শায়খের শায়খ মুহাম্মদ ইবন ফযল বলেন, ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রথম যখন আমার সামনে বসেন তখন তিনি এই হাদীছটি সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চান

এবং তা শোনানোর আবেদন জানান। যখন আমি এভাবে হাদীছটি বর্ণনা করতে শুরু করলাম... حدثنا حماد بن سلمة তখন তিনি বললেন, হযরত যদি পাণ্ডুলিপি দেখে বলতেন তা হলে খুব ভাল হত। ইবন ফযল যদিও প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ এবং লক্ষাধিক হাদীছের হাফেয ছিলেন তবুও ইয়াহইয়া চাইলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীছটি যেন সন্দেহমুক্ত হয়।

এরপর ভিতর থেকে পাণ্ডুলিপি আনতে যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন তখন ইয়াহইয়ার আশংকা হল, যদি তিনি ভিতরে গিয়ে কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অথবা কোন সমস্যায় আটকে পড়েন কিংবা– আল্লাহ না করুন– তাঁর মৃত্যু এসে পড়ে তাহলে তো আমি আর এই হাদীছটি পাব না। হাদীছ শোনার তীব্র আগ্রহে এবং তা হারানোর শংকায় তিনি ইবন ফযলের কাপড় টেনে ধরেন এবং আবেদন করেন, হযরত, আগে মুখস্থই লিখিয়ে দিন- কারণ ব্যস্ততার কথা তো বলা যায় না। আর জীবনের নিশ্চয়তাও দেয়া যায় না। তখন ইবন ফযল হাদীছটি বললে তিনি লিখে নেন। তারপর কিতাব আনলে দ্বিতীয়বার তা মিলিয়ে নেন।

এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, ইয়াহইয়া ইবন মাঈনের মাঝে সময়ের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং ইলমের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তি কী পরিমাণ ছিল! কতই না সজাগ ও সতর্ক ছিলেন তিনি হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে! আর কীভাবে তিনি এই সংক্ষিপ্ত জীবনে এত হাদীছ লিখেছেন, এত দেশ সফর করেছেন এবং অগণিত শায়খ থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং হাজার হাজার শাগরেদের মাধ্যমে তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

এই চিত্র শুধু ইয়াহইয়া ইবন মাঈন কেন, দুনিয়াতে যারাই বড় হয়েছেন, স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন এবং মহৎ ও মহান কোন কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জীবনেই রয়েছে এ জাতীয় বহু ঘটনা।

ইলমে অত্যাগ্রহী অতুলনীয় তিন ব্যক্তিত্ব

খতীব বাগদাদী র. তাঁর এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদকে উদ্ধৃতি করে বলেন, “ইলমের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তির ক্ষেত্রে তিন ব্যক্তির কোন দৃষ্টান্ত আমি কোথাও খুঁজে পাই না। তাদের প্রথম জন হলেন, জাহেয। যাঁর পুরো নাম হল, আমর ইবন বাহর। তিনি ছিলেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রপথিক। তাঁর জন্ম ১৬৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৫৫ হিজরীতে।

তাঁর হাতে যখনই কোন কিতাব আসত– তা যে বিষয়েরই হোক না কেন– তিনি তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলতেন। এক সময়– যখন তিনি মনের চাহিদা পূরণের জন্য সহজে কোন কিতাব পাচ্ছিলেন না তখন অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি লাইব্রেরীর সাথে চুক্তি করেন এবং দিন রাত সেখানে পড়ে থেকে কিতাব মুতালা'আ করতে থাকেন।

আর দ্বিতীয় জন হলেন, ফাতহ ইবন খা-কান। তিনি হলেন, রাজ পরিবারের সন্তান এবং একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক। আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে ভাইরূপে গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কিতাব সংগ্রহ ও মুতালা'আ ছিল তাঁর নেশা। ফলে এক সময় তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারকে বিশ্বে অন্যতম বৃহত্তম পাঠাগার গণ্য করা হতো।

আর তাঁর অধ্যয়নাসক্তির ইতিহাস তো আরও আশ্চর্যজনক। সব সময়ই তিনি সাথে কিতাব রাখতেন। যখনই খলীফার দরবার থেকে কোন প্রয়োজনে বের হতেন তখন হাঁটতে হাঁটতে কিতাবে চোখ বুলাতেন। এমনকি গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত তাঁর এই মুতালা'আ অব্যাহত থাকত। কাজ শেষে ফিরার পথেও একইভাবে কিতাবে চোখ রেখে ফিরতেন। এ ছাড়াও যখন খলিফা অল্পসময়ের জন্য কোন কাজে দরবার ছেড়ে উঠে যেতেন তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কিতাবে চোখ রাখতেন এবং খলীফা ফিরে আসা পর্যন্ত সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতেন। (তাঁর ইন্তেকাল হয় : ২৪৭ হিজরীতে)

আর তৃতীয় জন হলেন, মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ, কাজী ইসমাঈল ইবন ইসহাক বাগদাদী র. (২০০-২৮২ হি:) যখনই আমি তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছি তখনই দেখেছি তিনি কিতাব হাতে মুতালা'আ করছেন অথবা কোন কিতাব সন্ধান করছেন অথবা কোন কিতাব ঝাড়ছেন। যেন কিতাবই ছিল তাঁর সব কিছু।

খাবারের কথা মনেই ছিল না যাঁর

মুহাম্মাদ বিন সুহনূন কায়রাওয়ানী র. ছিলেন একজন মুহাদ্দিছ ও মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৫৬ হিজরীতে।

উম্মে মুদাম নামে তাঁর একটি বাঁদী ছিল। একদিন তিনি তার (উম্মে মুদামের) কাছে ছিলেন এবং রাত পর্যন্ত কিতাব সংকলনে ব্যস্ত ছিলেন। খাবারের সময় হলে বাঁদী তাঁকে খাবার গ্রহণের জন্য বলে। তখন তিনি বলেন, আমি তো এখন ব্যস্ত।

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন তাঁর ব্যস্ততা শেষ হল না, তখন বাঁদী তাঁকে খাবার মুখে তুলে খাইয়ে দিল। তিনি নিজ কাজে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, অল্পক্ষণেই তার খাওয়া হয়ে গেল। এমনকি রাতও পেরিয়ে গেল। যখন ফজরের আযান হল তখন তিনি নিজেই উঠে এসে বাঁদীকে বললেন, আমি তো অনেক ব্যস্ত ছিলাম। তোমার সাথে কথা-বার্তা বলারও সুযোগ হয়নি। যাই হোক, রাতের খাবারের কী ব্যবস্থা করলে, যা আছে নিয়ে আসো।

বাঁদী আশ্চর্য হয়ে বলল, কী বলছেন আপনি! রাতের খাবার তো আপনি খেয়ে নিয়েছেন। আমি নিজ হাতে আপনার মুখে খাবার তুলে দিয়েছি। তিনি বললেন, তাই নাকি, আমি তো কিছুই বলতে পারি না।[১১]

প্রিয় পাঠক! সময়ের প্রতি মমতা ও 'নির্মমতা'র এবং ইলমের প্রতি একাগ্রতা ও নিরবচ্ছিন্নতার এই চিত্রই ছিল তাঁদের জীবনে।

বেখেয়ালে এক ঝুড়ি খেজুর সাবাড়

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ র. (যিনি ইমাম মুসলিম নামে পরিচিত) এর জীবনেও প্রায় অভিন্ন ঘটনা ঘটেছিল। একবার মুহাদ্দিছগণ ইমাম মুসলিমের সাথে এক মজলিসে হাদীছ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করছিলেন। সেখানে হঠাৎ এমন একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল যা মুসলিম র. জানেন না। আলোচনা শেষে রাতে তিনি ঘরে ফিরে এসেই হাদীছটি খুঁজতে শুরু করেন। তখন তাঁর সামনে এক ঝুড়ি খেজুর রাখা হল। তিনি তা থেকে একটি একটি খেজুর নিতে থাকেন আর গভীর মনযোগসহকারে হাদীছটি তালাশ করতে থাকেন। রাত পেরিয়ে যখন ভোর হল তখন হাদীছটিরও সন্ধান মিলল। আর ঝুড়ির খেজুরও সব শেষ হল। কিন্তু রাত যে কীভাবে অতিবাহিত হল এবং এই পরিমাণ খেজুর কীভাবে খাওয়া হল তা কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না।

কেউ কেউ এ ঘটনার শেষে উল্লেখ করেছেন, বে-খেয়ালে অত্যধিক পরিমাণ খেজুর খাওয়াই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।[১২]

---

[১১] ترتيب المدارك কাযী ইয়ায, খ : ৫, পৃ: ২১৭

[১২] تهذيب التهذيب হাফেয ইবন হাজার খ : ১০, পৃ : ১২৭

পাঠাসক্তি যখন মৃত্যুর কারণ

আহমদ ইবন ইয়াহইয়া শায়বানী- যিনি 'ছা'লাব' নামেই অধিক পরিচিত। তিনি একাধারে আরবীভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, ইলমে হাদীছ ও ইলমে কেরাতের ইমাম ও পথিকৃত ছিলেন। তাঁর জন্ম ২০০ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৯১ হিজরীতে। তিনি কখনোই কিতাব ছাড়া থাকতেন না। সব সময়ই কোন না কোন কিতাব মুতালা'আ করতেন, তাঁকে কেউ দাওয়াত দিলে তিনি শর্ত করে নিতেন, আমাকে অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। এজন্য চামড়ার বালিশ বা টেবিল সদৃশ কিছুর ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যাতে কিতাব রেখে আমি মুতালা'আ করতে পারি।[১৩]

মুতালা'আ ও অধ্যয়নের প্রতি এই আগ্রহ ও আসক্তিই অবশেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। ঘটনা এই- শেষ জীবনে তাঁর শ্রবণশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। খুব জোরে না বললে শুনতে পেতেন না। এমতাবস্থায় এক শুক্রবারে আসরের পরে তিনি জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে রাস্তায় হাঁটছিলেন এবং কিতাব মুতালা'আ করছিলেন। হঠাৎ ছুটে আসা একটি ঘোড়া তাঁকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেয় এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। যখন তাঁকে সেখান থেকে তোলা হয় তখন প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় তিনি উহ্ আহ্ করছিলেন। সে অবস্থায়ই তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। আর পর দিনই তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন, আমীন)[১৪]

প্রতিদিন ১৪ পাতা রচনা

ইবন জারীর তাবারী ছিলেন বিপুল জ্ঞানের অধিকারী বিদগ্ধ গবেষক এবং বরেণ্য আলিম। খ্যাতনামা সব মুহাদ্দিছ, মুফাসসির এবং ঐতিহাসিকদের উস্তায ও শায়খ। সময়ের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণে তিনি ছিলেন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিজের প্রতিটি মুহূর্তের তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন এবং সর্বদা শিক্ষণ ও গ্রন্থ সংকলনের কাজে নিমগ্ন থাকতেন। ফলে তাঁর লিখিত ও সংকলিত গ্রন্থপঞ্জি বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত হয়। যার ব্যাপ্তি ও আয়তন সত্যিই বিস্ময় উদ্রেককারী।

---

[১৩] الحث على طلب العلم والإجتهاد في جمعه আবু হেলাল আসকারী, পৃ : ৭৭।

[১৪] وفيات الأعيان ইবন খাল্লিকান, খ : ১ পৃ : ১০৪।

আল্লামা ইয়াকুত হামাবী র. তাঁর معجم الأدباء গ্রন্থে সংক্ষেপিতভাবে প্রায় ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী ইবন জারীর তাবারীর কর্মমুখর জীবনী আলোচনা করেছেন।[১৫]

আর হাফেয বাগদাদী তাঁর تاريخ بغداد গ্রন্থেও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[১৬]

উভয়ের লেখার অংশ বিশেষের সারনির্যাস সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। "........ একবার আল্লামা তাবারী তাঁর শিষ্যদেরকে একত্র করে বললেন, তোমরা কি একটি তাফসীর গ্রন্থ লিখতে আগ্রহী?

তারা বলল– হযরত, এর কলেবর কেমন হবে?

তিনি বললেন, আমার তো ইচ্ছা ত্রিশ পারার জন্য ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা।

তারা বলল, হযরত, তা রচনায় তো কয়েক জীবন পেরিয়ে যাবে! একটু সংক্ষেপে চিন্তা করলে তো আমরা সাহস করতে পারতাম।

তখন তাদের অনুরোধে তিনি তা কমিয়ে ন্যূনতম তিন হাজার পৃষ্ঠা করতে বলেন। এবং ২৮৩ হিজরী থেকে ২৯০ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছরে তাদেরকে দিয়ে তা লিখিয়ে শেষ করেন।

এই বিরাট খিদমত আঞ্জাম দেয়ার পর তিনি আবার শাগরেদগণকে বললেন, তোমরা কি একটি ইতিহাস গ্রন্থ লিখতে প্রস্তুত আছ, যা আদি পিতা হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করবে?

তখন তারা গ্রন্থের আকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তফসিরের ক্ষেত্রে যেমন বলেছিলেন তেমনই বললেন। শাগরেদগণও একই উক্তির পুনরাবৃত্তি করল। তখন তিনি আফসোস করে বললেন, 'ইন্নালিল্লাহ! আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস দেখছি আজকাল হারিয়েই গেছে।' তারপর তিনি সংক্ষিপ্তাকারে তা তিন হাজার পৃষ্ঠায় লেখার কথা বলেন এবং ৩০২ হিজরীর শেষ দিকে তাদেরকে দিয়ে লেখানোর কাজ শেষ করেন। আর ৩০৩ হিজরীর রবিউছ ছানীতে তা পুনরায় তাদের থেকে শুনে শেষ করেন।

খতিব বাগদাদী র. লিখেন, আমি 'সিমসিম'কে বলতে শুনেছি যে, ইবন জারীর র. তাঁর জীবনে এমন চল্লিশটি বছর কাটিয়েছেন, যাতে তিনি শিক্ষণ-অধ্যয়ন ও সাংসারিক কাজ-কর্ম সত্ত্বেও প্রতিদিন চল্লিশ পাতা লিখেছেন।

---

[১৫] খ : ১৮ পৃষ্ঠা : ৪০-৯৬।

[১৬] খ : ২ পৃষ্ঠা : ১৬২-১৬৯।

শাগরেদগণ তাঁর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দিন ও তাঁর হাতে লিখিত পাতার হিসাব করে দেখেছেন যে, গড়ে প্রতি দিন ১৪ পাতা করে লিখা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠক, এ থেকে আমরা সহজেই তাঁর রচনার ব্যাপ্তি ও কলেবর আন্দায করতে পারি।

তাঁর জন্ম ২২৪ হিরজীতে এবং মৃত্যু ৩১০ হিজরীতে। জীবনকাল ৮৬ বছর। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বকাল তথা প্রায় ১৪ বছর বাদ দেয়া হলে বাকী থাকছে ৭২ বছর। এর প্রতিদিন ১৪ পাতা লেখা হলে তার মোট লেখার পরিমাণ হয় ৭২ × ৩৬০ × ১৪ = ৩,৬২,৮৮০ পাতা।

তাঁর ইলমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিবেচনা করলে মনে হবে, তা যেন বহু শাস্ত্র ও বিষয় সম্বলিত এক বিশ্বকোষ। আর তাঁর রচনা সম্ভার দেখলে মনে হয় যেন তা কোন বিশাল প্রকাশনালয়ের কীর্তি। অথচ তা এক ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত। আর (ইতিহাস ও তাফসীর সংকলনের ৬/৭ হাজার পৃষ্ঠা ছাড়া বাকীটুকু) এক ব্যক্তির কলম নিঃসৃত।

কিন্তু পাঠক! এমন কীর্তির সৃষ্টি কি সম্ভব হতো, আর এমন কৃতিত্বের প্রকাশও কি ঘটত, যদি সময়ের যথাযথ ব্যবহার না হত! সর্বদা সময়কে কাজ দিয়ে পূর্ণ করে রাখা না হত!!

মৃত্যুর দুয়ারে ইলম তলব

তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর এক শাগরেদ কাজী আবু বকর বিন কামেল র. বলেন, তিনি সকালের খাবার খেয়ে ছোট হাতার একটি চটের জামা গায়ে ঘুমিয়ে যেতেন। ঘুম থেকে উঠে ঘরেই যোহরের নামায আদায় করে কলম ধরতেন এবং আছর পর্যন্ত কিতাব সংকলনের কাজে মশগুল থাকতেন। তারপর মসজিদে আসরের নামায পড়ে মাগরিব পর্যন্ত হাদীছের দরস দিতেন। এরপর থেকে এশা পর্যন্ত ফিকহের দরস চলত। এশার নামায আদায় করে তিনি ঘরে ফিরে যেতেন।

দিন-রাতে সবসময় তিনি নিজের, অন্যের কিংবা দ্বীনের কোন না কোন কল্যাণ কর্মে অবশ্যই মশগুল থাকতেন।

উস্তায মুহাম্মাদ কুর্দ আলী ইবন জারীর তাবারী র. এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন[১৭]– 'তিনি জীবনের একটি মিনিট সময় নষ্ট করেছেন

---

[১৭] كنوز الأجداد মুহাম্মাদ কুরদ আলী পৃ: ১২৩

কিংবা ইফাদা ও ইস্তেফাদা তথা শিক্ষাপ্রদান বা শিক্ষাগ্রহণ ব্যতীত কাটিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

সে যুগের জনৈক আলিম বর্ণনা করেন যে, ইবন জারীর তাবারীর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি তাঁর কাছে ছিলেন, তখন কোন একজন জাফর ইবন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত একটি দু'আ উল্লেখ করলে তিনি কাগজ-কলম আনতে বলেন এবং উঠে লেখার চেষ্টা করেন, তখন তাঁকে বলা হয়, হযরত এ মুহূর্তে ....? তিনি বললেন, 'প্রতিটি মানুষের উচিৎ মৃত্যু পর্যন্ত ইলম অর্জনে মগ্ন থাকা, সামান্যতম সুযোগ পেলেও তা হাতছাড়া না করা।

এর ঘণ্টাখানেক কিংবা আরও কম সময় পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন এবং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

চলার পথেও পড়তেন যিনি

আবু বকর ইবনুল খাইয়্যাত র. ছিলেন আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইমাম (মৃত্যু ৩২০ হিজরী)। তাঁর অধ্যয়ন আসক্তি এত প্রবল ছিল যে, এক মুহূর্তও মুতালা'আ ছাড়া তিনি থাকতে পারতেন না। এমনকি পথ চলার সময়ও তিনি পড়তে থাকতেন। অনেক সময়ই এমন হয়েছে যে, তিনি এ কারণে পথের গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছেন। আবার কখনও বা কোন বাহন জন্তুর সাথে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়েছেন[১৮]।

একাধারে মন্ত্রী, বিচারক, লেখক ও শিক্ষক

আবুল ফযল মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমদ মারওয়াযী র. ছিলেন একাধারে মন্ত্রী ও বিচারক এবং তৎকালীন হানাফী মাযহাবের ইমাম। ৩৩৪ হিজরীতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এরপর থেকেই তিনি 'শহীদ শাসক' হিসেবে পরিচিত।

তাঁর সম্পর্কে "আল আনসাব" الأنساب প্রণেতা উল্লেখ করেন[১৯], 'তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি প্রতি সোম ও বুধবারে রোযা রাখতেন, আর সফরে থাকুন কিংবা নিজ গৃহে, কখনোই

---

[১৮] الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه আবু হেলাল আসকারী, পৃ: ৭৭।

[১৯] الأنساب সাম'আনী, খ : ৭ পৃ: ৪২৫ (দামেস্কী ছাপায়) খ: ৮, পৃ: ১৮৯ (ভারতীয় ছাপায়)

তাহাজ্জুদ তরক করতেন না। তাঁর সামনে সবসময় কিতাব ও খাতা-কলম প্রস্তুত থাকত। রাজকার্জ ও বিচার কার্জ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করেই তিনি তাছনীফের কাজে লেগে যেতেন।

যারা বাদশাহের সাক্ষাতের অনুমতি পেত না; আবেদন-নিবেদন জানানোর সুযোগ পেত না, তারা সবাই তাঁর কাছে আসতো। নিজেদের আবেদন ও অভিযোগ পেশ করত। এই কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করেই তিনি লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তখন সাক্ষাতপ্রার্থীরা প্রস্থান করতো।

একবার আবুল আব্বাস বিন হামাভী তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ করে বলেন, আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলাম অথচ তিনি আমাদের সাথে কথাই বললেন না; হাতে কলম ধরে রাখলেন এবং সব মনোযোগ তাতেই নিবিষ্ট রাখলেন, আমাদের দিকে চোখ তুলেও তাকালেন না।

"মুসতাদরাক" প্রণেতা হাকিম আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমি একবার শুক্রবার রাতে হাকিম আবুল ফযলের 'ইমলা'র মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন প্রাদেশিক প্রশাসক আবু আলী বিন আবু বকর এলেন এবং হাকিম সাহেবের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অথচ তিনি স্বস্থান থেকে একটুও নড়লেন না। দীর্ঘক্ষণ পর তাকে বললেন, আমীর সাহেব! আজ ফিরে যান; আপনার সাথে সময় দেয়ার মত আজ আমার সুযোগ নেই। এই বলে ছাপড়া ঘরের দরজা থেকেই সেই প্রশাসককে ফিরিয়ে দেন।

সাতশ' দিরহামের কালি

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইবন শাহীনের (২৯৭-৩৮৫ হিজরী) জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাফেয যাহাবী র. বলেন, "...... তাঁর পুরা নাম হল, আবু হাফস উমর ইবন আহমদ ইবন উসমান বাগদাদী। তাকে محدّث العراق (তথা ইরাকের মুহাদ্দিছ) বলা হত। তবে তিনি 'ইবন শাহীন' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। প্রায় লক্ষাধিক হাদীছ তাঁর মুখস্থ ছিল এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে সেগুলো রিওয়ায়েতও করেন। তাছাড়া রচনা সংকলনের জগতেও তিনি বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁর এক শাগরেদ– আবুল হুসাইন বিন মুহতাদী বিল্লাহ বলেন, ইবন শাহীন আমাদেরকে বলেছেন, আমি প্রায় ৩৩০টি গ্রন্থ রচনা করেছি। তার মাঝে রয়েছে التفسير الكبير যার কলেবর

প্রায় ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা। المسند প্রায় চল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা। التاريخ প্রায় সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠা এবং الزهد প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠা[২০]।

মুহাম্মাদ বিন উমর দাউদী বলেন, আমি ইবন শাহীনকে বলতে শুনেছি, 'আমি এ পর্যন্ত যে পরিমাণ কলমের কালি ব্যয় করেছি, হিসাব করে দেখলাম তার মূল্য প্রায় সাতশ' দিরহাম।'

তাইতো তাঁর সম্পর্কে ইবন আবিল ফাওয়ারিছ র. বলেন, আল্লামা ইবন শাহীন যে পরিমাণ কিতাব রচনা করেছেন আর কেউ তা করতে পারেনি।

ব্যক্তির নাম 'মুযাকারা'

আল্লামা মুনযির মারওয়ানী র. এর উপাধি হয়ে গিয়েছিল المذاكرة (অর্থাৎ, পর্যালোচনা)। কারণ যখনই কোন আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাত হত তখনই তিনি তার সাথে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করে দিতেন।

এ ব্যাপারে হাফেয ইবন হাজার র. তাঁর نزهة الألباب فى الألقاب গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "মুনযির বিন আবদুর রহমান বিন মুআবিয়া র. এর উপাধি ছিল المذاكرة । তিনি ছিলেন আন্দালুসের অধিবাসী এবং ইলমে নাহু ও ইলমুল লুগাত তথা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বের একজন ইমাম ও পথিকৃত। যখনই কোন বন্ধু বা কোন আলেমের সাথে তাঁর দেখা হত তিনি তাকে বলতেন, 'আপনার কি সুযোগ আছে, আমি আপনার সাথে ভাষাতত্ত্বের এই বিষয়টি বা এই অধ্যায়টি নিয়ে মুযাকারা করতে চাই।' এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই তার উপাধিই হয়ে যায়, 'মুযাকারা", তাঁর মৃত্যু হয় ৩৯৩ হিজরীতে।

হাদীছ শ্রবণ হত যাঁর আত্মা ও দেহের খোরাক

হাফেয[২১] আহমদ ইবন আবদুল্লাহ, যার উপনাম ছিল আবু নু'আইম ইস্পাহানী। একই সাথে তিনি ছিলেন, হাদীছ বিশারদ, ইতিহাসবেত্তা ও সুফী সাধক। তাঁর জন্ম ৩৩৬ ও মৃত্যু ৪৩০ হিজরীতে। হাফেয যাহাবী

---

[২০] تذكرة الحفاظ হাফেয যাহাবী, খ: ৩, পৃ : ৯৮৭

[২১] হাদীছ শাস্ত্রের হাফেয বলা হয় যার লক্ষাধিক হাদীছ মুখস্থ আছে তাকে।

تذكرة الحفاظ গ্রন্থে[২২] তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, "আহমদ ইবন মারদাওয়ায়হি বলেন, আবু নু'আয়মের যুগে লোকজন হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে সফর করে আসত। সে কালে তিনি ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী এবং সবচে' বড় হাফেযে হাদীছ। তাই তাঁর দরবারে মুহাদ্দিছদের ভিড় লেগে থাকত। প্রতিদিন তাদের একজনের পালা থাকত; ফযরের পর তিনি তার থেকে হাদীছ শুনতেন এবং নতুন কিছু শিখাতেন ও লেখাতেন। এভাবে চলত যোহর পর্যন্ত। তারপর দারসি মজলিস ত্যাগ করে নিজ ঘরের দিকে পা বাড়াতেন। কখনও কখনও সময় স্বল্পতার কারণে চলার পথেও তাঁকে হাদীছ শুনানো হত। কিন্তু এতে তিনি একটুও বিরক্তিবোধ করতেন না। এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর কোন খাবার গ্রহণের সুযোগ হত না। হাদীছ শ্রবণ ও সংকলনই হত তখন তাঁর আত্মা ও দেহের খোরাক।

মৃত্যুর পূর্বেও মাসআলা আলোচনা

মুহাম্মাদ ইবন আহমদ খুয়ারিযমী র. ছিলেন একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ এবং সুযোগ্য ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। এছাড়াও তিনি ছিলেন বিপুল জ্ঞানের অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্ম ৩৬২ ও মৃত্যু ৪৪০ হিজরীতে। লোকজন তাঁকে 'আবু রায়হান বিরুনী' নামে চিনত।

এই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইয়াকুত হামাভী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মু'জামুল উদাবা'য়[২৩] লিখেন, 'ভোগ বিলাসের মাঝে জীবন অতিবাহিত করার সকল উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে পথ অবলম্বন না করে তিনি জ্ঞান অন্বেষণ ও গ্রন্থ সংকলনে নিবেদিত ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি অনেক অভিনব বিষয়ের উদ্ভাবন করেন এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থের সূক্ষ্ম ও জটিল, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয়, প্রাঞ্জল ও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেন। সর্বদা তাঁর হাত থাকত কলমে আর চোখ থাকত কিতাবের পাতায় নিবিষ্ট আর হৃদয় থাকত জ্ঞান-চিন্তায় নিমগ্ন। সারা বছরে

---

[২২] খ: ৩, পৃ: ১০৯৪

[২৩] খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ১৮১-১৮২।

শুধু ঈদ এবং উৎসবের কয়েকটা দিন তিনি অন্য কাজে কাটাতেন, জীবন ধারণের সামান্যতম উপকরণ সংগ্রহে ব্যয় করতেন। আর সারা বছর নিয়োজিত থাকতেন জ্ঞান ভাণ্ডারের বদ্ধ দ্বার উন্মোচন ও অস্পষ্টতার আবরণ অপসারণে।

বিশিষ্ট ফকীহ্ আবু হাসান আলী বিন ঈসা বলেন, যখন আমি আল্লামা আবু রায়হানের সাক্ষাতে গেলাম, তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়। তাঁর মাঝে মৃত্যুপূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। অনেক কষ্টে তিনি কথা বলছিলেন। সে মুহূর্তে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মিরাছের ক্ষেত্রে "দাদীর (নির্ধারিত) অংশ যেন কী বলেছিলে?

তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে আমি বললাম– হযরত এই অবস্থায় ....! তখন তিনি আমাকে বললেন, বল দেখি, কোন অবস্থা আমার জন্য ভাল– দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্বে এই মাসআলা জেনে নেয়া, নাকি তা না জেনেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া?

তখন আমি লা-জওয়াব হয়ে গেলাম এবং তার সামনে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করলাম। তখন তিনি তা আত্মস্থ করে নিলেন। আর যে সব বিষয়ে তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন সেগুলো আমাকে শেখাতে লাগলেন। অবশেষে ভাবলাম, আমি যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকব তিনি এসব আলোচনা করতেই থাকবেন আর তাঁর কষ্টও বাড়তেই থাকবে। তাই আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে এলাম, কিন্তু দরজা পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখতেই ঘর থেকে সমস্বরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। (অর্থাৎ তিনি ইন্তিকাল করলেন।)

এই বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি একাধারে আরবি, সুরয়ানি, সংস্কৃত, ফার্সি এবং হিন্দি এই পাঁচটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আর জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ 'জর্জ স্যারতুন' তাঁর সম্পর্কে বলেন– তিনি হলেন "ইসলামের এক মহান ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের অন্যতম।

তাঁর ব্যাপারে আরেক প্রাচ্যবিদ 'কার্ল সাখাও' মন্তব্য করেছেন "ইতিহাসের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে তিনি স্বীকৃত। [২৪]

---

[২৪] এই মনীষী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন– হাফেয তাওকানের গ্রন্থ– تراث العرب العلمى فى الفلك والرياضيات

সময়ের ব্যাপারে আত্মজিজ্ঞাসা

তাজুদ্দীন সুবকী রচিত طبقات الشافعية الوسطى নামক গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম সুলাইম রাযী র. (মৃত্যু ৪৪৭ হিজরী) এর জীবনীতে উল্লিখিত আছে, জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। আর তা হল, সব সময় তিনি নিজেকে সময়ের ব্যাপারে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করতেন; যেন তার একটি মুহূর্তও অপচয় না হয়। সারাদিন তিনি হয়ত অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা অথবা কলম চালনায় ব্যস্ত থাকতেন।

হাফেয ইবন আসাকির তাঁর সম্পর্কে تبيين كذب المفترى গ্রন্থে লিখেন "আমাদের এক উস্তায, আবুল ফারাজ আসফারায়ীনী বলেছেন, একবার সুলায়ম রাযী কিছুক্ষণের জন্য আমার কাছে আসেন এবং অল্পক্ষণ অবস্থান করেই ফিরে যান। পরবর্তীতে তিনি বলেন, আমি এই আসা-যাওয়ার পথেই কিতাবের একটি বড় অংশ পড়ে ফেলেছি।

আবুল ফারাজ আরও বলেন, মুআম্মিল বিন হাসান র. নিজ চোখে দেখা একটি ঘটনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেন– "লেখার মাঝে একবার আল্লামা সুলাইমের কলম ভেঙে যায়। তখন তিনি কলমের মাথা চাঁছতে লাগলেন। যতক্ষণ তিনি এই কাজে ব্যস্ত ছিলেন ততক্ষণ তার ঠোঁট নড়ছিল। অর্থাৎ কলম ঠিক করার সময়টুকুও যেন অপচয় না হয়- এই সচেতন-চিন্তাই তাঁকে তখন যিকিরে মশগুল রেখেছে।

তাঁর সবসময়ই চিন্তা থাকত, একটি মুহূর্তও যেন অবসর বা ফায়দাহীন কাজে ব্যয় না হয়। আল্লাহ্ তাঁকে এই মহামূল্যবান সম্পদ-সময় সম্পর্কে কতই না সচেতনতা ও দূরদর্শিতা দান করেছিলেন!

খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রাগমন শুধু প্রয়োজনে

এরপর বলা যায় আবুল মা'আলী আবদুল মালিক ইবন আবদুল্লাহ নিশাপুরী র. এর কথা। যিনি ছিলেন একই সাথে ইসলামী আইন ও নীতি-শাস্ত্রবিদ এবং সূক্ষ্মদর্শী ধর্মতত্ত্ববিদ ও যুক্তিবাদী। তিনি ইমাম গাযালীর শায়খ ছিলেন। তাঁর জন্ম ৪১৯ হিজরীতে এবং মৃত্যু ৪৭৮ হিজরীতে। 'ইমামুল হারামায়ন' উপাধিতেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আবদুল

গাফের ফারসী স্বীয় গ্রন্থ سياق نيسابور এ লিখেন, "মদীনার ইমাম, ইসলামের অহংকার, ইমামকুল শিরোমণি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বজন স্বীকৃত ধর্মীয়নেতা, ইসলাম ধর্মের 'যাজক', বিরল প্রতিভাধর আবুল মা'আলী আবদুল মালিক র. কে কথা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, "আমি অভ্যাসবশত ও সময় নির্ধারিতভাবে খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রাগমন করি না। বরং দিনে কিংবা রাতে যখন ঘুম আমার চোখে জেঁকে বসে তখন সামান্য ঘুমিয়ে নেই। আর যখন ক্ষুধার তীব্র যাতনা বোধ করি এবং ক্ষুধার তাড়না যখন শেষ মুহূর্তে উপনীত হয় তখনই সমান্য খাবার গ্রহণ করি।" লেখক বলেন, তাঁর আগ্রহ-উদ্দীপনা, আনন্দ-বিনোদন সবই ছিল জ্ঞান অন্বেষণে, অর্থাৎ সময়ের সদ্ব্যবহারে।

'ইমামুল আইম্মাহ' হয়েও শিষ্যত্ব গ্রহণ

আবুল হাসান আলী মুজাসী র. ছিলেন তাঁর সময়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ। তাঁর জন্ম ৪৬৯ হিজরীতে। তিনি ইমামুল হারামাইন সম্পর্কে বলেন, ইলমের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তির ক্ষেত্রে আমি তাঁর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই না। তিনি ইলম অন্বেষণ করতেন শুধু ইলমের জন্যই; অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর, যখন তিনি তাঁর যুগের 'ইমামুল আইম্মাহ' উপাধিতে ভূষিত তখন তিনি ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আমাকে নির্বাচিত করেন এবং আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিদিন তিনি বাহন পাঠিয়ে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং আমার إكسير الذهب في صناعة الأدب কিতাবটি আমার কাছে অধ্যয়ন করতেন। আর এটা ইলমের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ও প্রগাঢ় নিষ্ঠারই প্রমাণ।

মুহূর্তকাল সময়ও কর্মশূন্য থাকা অবৈধ

সময়ের প্রকৃত মূল্যের বোধ ও উপলব্ধি এবং তা থেকে সর্বোচ্চ উপকার গ্রহণের আগ্রহ ও আসক্তি আর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপযুক্ত কাজে কর্মময় ও সাধনাসমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে হাম্বলী ফকীহগণের মাঝে, বরং বলা যায় বড় বড় ইমামগণের মাঝে যারা শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন দু'ব্যক্তি। এক. ইমাম আবুল ওফা ইবন আকিল হাম্বলী র.। যিনি ছিলেন খতীব বাগদাদীর অন্যতম শাগরেদ। দুই. ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী র.। যিনি ইবন আকীল র. এর শাগরেদের শাগরেদ।

আবুল ওফা ইবন আকীল র. : তাঁর জন্ম ৪৩১ হিজরী এবং মৃত্যু ৫১৩ হিজরীতে। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী ও বহুশাস্ত্রে পারদর্শী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

তিনি বলতেন, জীবনের একটি মুহূর্তও নষ্ট করা বা কর্মশূন্য রাখা আমার কাছে বৈধ মনে হয় না। কখনো এমন হয়নি যে, ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মুহূর্ত আমি নষ্ট করেছি। এমনকি আমার জিহ্বা যখন কোন ইলমি আলোচনা ও পর্যালোচনা আর চোখ মুতালা'আ ও অধ্যয়ন থেকে ফারেগ থাকে– অর্থাৎ আমি যখন শুয়ে থকি বা বিশ্রাম নিই– তখনও আমি একেবারে কর্মশূন্য থাকতে পারি না; মন ও মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখি, ইলমি চিন্তায় বা কোন বিষয়–ভাবনায় মশগুল থাকি। ফলে যখনই বিশ্রাম শেষ হয়, ঘুম ভাঙে তখনই লেখায় মগ্ন হতে পারি। বিষয়-ভাবনায় আর বাড়তি সময় ব্যয় করতে হয় না।

আমার তো মনে হয় বিশ বছর বয়সে ইলমের প্রতি আমার যে আগ্রহ ও আসক্তি ছিল– আজ আশি বছর বয়সে– তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এটাই আমার উপলব্ধি।

তিনি আরও বলেন, অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলোর ক্ষেত্রেও আমি সময় বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এমনকি খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটে না। শক্ত রুটি না খেয়ে আমি কেক জাতীয় নরম কিছু ভিজিয়ে খেয়ে নিই। ফলে খাবার চিবানোর সময়টুকু বেঁচে যায়। আর তা আমি কোন বিষয় অধ্যয়নে বা উপকারী কিছুর লিখনে ব্যয় করতে পারি।

.... আর এমনটা তো করতেই হবে। হেফাযত করার মত এরচে' দামী সম্পদ আর কী হতে পারে? দায়িত্ব ও কর্তব্য তো আমাদের বেশুমার, অথচ সময় তো অল্প, অতি অল্প।

শায়খ ইবনুল জাওযী বলেন, ইবন আকীল সব সময়ই ইলম অন্বেষণ ও অনুশীলনে মশগুল থাকতেন। যে কোন শাস্ত্রের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয় উদঘাটন আর অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর বিষয় স্পষ্টকরণই ছিল তাঁর কাজ। তাছাড়াও তিনি ছিলেন চমৎকার চিন্তা-ভাবনার অধিকারী।

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। কারো কারো মতে প্রায় বিশটির মত বৃহৎগ্রন্থ রয়েছে তাঁর। তার মধ্যে সবচে' বড় হল الفنون নামক গ্রন্থটি, এটাকে গ্রন্থ না বলে বিশ্বকোষ বলাই শ্রেয় বলে মনে হয়। কারণ এতে লেখক গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল বিষয়ই সন্নিবেশিত করেছেন। যথা:

ওয়াজ-নসিহত, তাফসীর-ফিকহ, উসূলে-দ্বীন, নাহব-ছরফ, ভাষাতত্ত্ব ও কবিতা এবং ইতিহাস ও গল্প- কাহিনী। এছাড়াও আছে তাঁর বিভিন্ন শিক্ষা-মজলিস ও আলোচনা-পর্যালোচনা, মুনাযারা ও চিন্তা-ভাবনা।

হাফেয যাহাবী র. তো এ কিতাব সম্পর্কে এতটুকু বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত দুনিয়াতে এরচে' বৃহৎ কলেবরের কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।

এই কিতাবটির চার'শ খণ্ডের পরের কোন একটি খণ্ড দেখেছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবন রজব সহ অনেকেই বলেছেন এটি আট'শ খণ্ডের এক মহাগ্রন্থ।

সবই লিখে রাখতেন যিনি

ইবন আকীল র. তাঁর সেই বিশাল গ্রন্থ الفنون (আল-ফুনূন) এর প্রথম খণ্ডের শুরুতেই লিখেছেন, সময়ের সদ্ব্যবহারে নিজেকে নিয়োজিত করে তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করার সবচে' উত্তম পন্থা হল, এমন জ্ঞান অর্জন করা, যা তাকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে শরীয়তের জ্যোতির্ময় পথে বের করে আনবে, হেদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা দেবে এবং তাতে পরিচালিত করবে।

নিজেকে আমি এমন কর্মেই ব্যস্ত রাখি এবং তা অর্জনেই আমার সময় ব্যয় করি। এমনকি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মজলিস থেকে এবং কিতাবের পাতা ও হৃদয়ের চিন্তা-ভাবনা থেকে আমি যা কিছু অর্জন করি তার সবই সযত্নে লিখে রাখি। আর আশা রাখি, হয়তো বা আমি এর মাধ্যমে ছাওয়াব ও কল্যাণ এবং ইহ ও পরকালীন মর্যাদা লাভ করব, মূর্খতা ও জাহালাত থেকে দূরে আসতে পারব এবং পূর্বসূরী আলিম উলামাদের পথে কিছুটা হলেও অগ্রসর হতে পারব।

ছোট ছোট সবকিছু টুকে রাখার ন্যূনতম ফায়দা আপাত দৃষ্টিতে যদি এরচে' বেশী কিছু নাও হয় যে, এর মাধ্যমে আমার এই সময়টুকু নীচ ও ঘৃণ্য কাজ-কর্ম থেকে, অনর্থক ও অযথা কথা-বার্তা থেকে রক্ষা পেল, তবে এই প্রাপ্তিটুকুও কম নয়। আর সঠিক পথের দিশা! সে তো আল্লাহর হাতে :

وَهو حسبى ونعم الوكيل

তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই প্রকৃত কর্ম বিধায়ক।'

পঞ্চাশ বছর ধরে আল্লাহর পক্ষ থেকে দস্তখত

ইবনুল জাওযী র. বলেন, ইমাম আবুল ওফা ইবন আকীল যখন মুমূর্ষু অবস্থায়, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উপনীত, পরিবারের নারীরা যখন তাঁর জন্য ক্রন্দনরত তখন তিনি বলেন, 'পঞ্চাশ বছর ধরে আমি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে দস্তখত করে আসছি, তবে আমার জন্য তোমাদের দুঃখ কিসের? আমি তো তাঁর সাক্ষাতে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করব, ইনশাআল্লাহ।'

এই মহান আলিম দুনিয়াতে তাঁর সুবিশাল গ্রন্থভাণ্ডার এবং পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। আর এগুলির (অর্থাৎ, পরিধেয় বস্ত্রের) পরিমাণও এত সামান্য যে, তার অর্থমূল্য ছিল তাঁর কাফন ও সামান্য ঋণের সমপরিমাণ।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন, সময়ের হেফাযত ও তা সংরক্ষণ করা, ইচ্ছা শক্তি ও চিন্তা-ভাবনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা এবং ইলম অন্বেষণ ও কল্যাণ অর্জনে অব্যাহত মেহনত করে যাওয়া এমন বিরাট সুফল বয়ে আনতে পারে, যা প্রায় অবিশ্বাস্য, অথচ এটাই বাস্তব সত্য।

চিন্তা করে দেখুন, এক ব্যক্তি সংকলিত আটশ' খণ্ডের কিতাব! এছাড়াও তিনি আরও প্রায় বিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার কোনটি আবার দশ খণ্ডে বিস্তৃত।

বিন্দু থেকে সিন্ধু

ইমাম বাহাউদ্দিন ইবনুন্ নাহ্হাস হালাবী র.[২৫] ইবন আকীল র.এর এই বিশাল ইলমী খেদমতের দিকে ইঙ্গিত করতঃ অত্যন্ত চমৎকার দু'টি পঙক্তি রচনা করেন এবং তাতে তিনি একথার দিকে ইঙ্গিত করেন যে, বিন্দু বিন্দুর ধারাবাহিকতা এক সময় সিন্ধুর রূপ নেয়। যেমনটা হয়েছে আবুল ওফা ইবন আকীল র. এর গ্রন্থ ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে। পঙ্ক্তি দু'টি হল–

اليومَ شيءٌ وغدًا مثلُه ✪ مِنْ نُخبِ العلمِ التي تُلتقط

يُحصِّلُ المرءُ بها حكمة ✪ وإنما السيلُ اجتماعُ النُّقط

আজ সামান্য কাল সামান্য, তা থেকে যা, সেরা জ্ঞানের অনন্য,
যা দ্বারা হয় প্রজ্ঞা অর্জন, আর বহু বিন্দুর সমাহারতো সিন্ধু অসামান্য।

---

[২৫] যার পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম। তিনি ছিলেন একজন নাহুবিদ। মৃত্যু: ৬৯৮ হিজরীতে।

সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার উপলব্ধি অপরিহার্য

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী র. : যার পুরো নাম হল আবদুর রহমান বিন আলী হাম্বলী বাগদাদী। তাঁর জন্ম ৫০৮ হিজরীতে এবং মৃত্যু ৫৯৭ হিজরীতে। জীবনকাল মোট ৮৯ বছর। তিনিও সময়ের সদ্ব্যবহারে ছিলেন পূর্ণসচেতন। যার ফলাফল এই যে, তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক।

আমরা তাঁর জীবনী থেকে অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করছি। যেন পাঠক উপলব্ধি করতে পারেন, সময়ের গুরুত্ব ও মূল্যবোধ তাঁর মাঝে কী পরিমাণে ছিল আর কীভাবে তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন, যখন কোন দর্শনার্থী বা সাক্ষাতপ্রার্থী তাঁর কাছে আসত কিংবা অলস ও অকর্মণ্য লোকেরা যখন তাঁর দরবারে ভিড় জমাত।

তিনি তাঁর صيد الخاطر গ্রন্থে লিখেন– 'প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য হল সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করা। প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যাণকর এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির কথা ও কাজে অতিবাহিত করা। উন্নত থেকে উন্নততর এবং উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর কথা ও কাজের ধারা অব্যাহত রাখা। সব সময় যদি কল্যাণকর কাজ করার সম্ভাবনা ও সুযোগ না-ও হয় সে ক্ষেত্রে অন্তত কল্যাণকর্মের নিয়ত রাখাতো কোন কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব কিছু নয়। উম্মতের প্রতি দরদী নবীর দরদমাখা ঘোষণা কি তোমরা শুননি! نِيَّةُ المؤمنِ خيرٌ مِنْ عَمَله অর্থ : মুমিনের নিয়্যাত তো তার কাজ থেকে উত্তম।

আমাদের পূর্বসূরীদের মাঝে এমন অনেকেই গত হয়েছেন যাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহারে প্রতিযোগিতা করতেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতেন। যেমন : আমের ইবন আবদে কায়স র., যিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ও পরহেযগার তাবেয়ীদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি তাকে বললো, ভাই একটু দাঁড়ান, আপনার সাথে কথা বলব। তিনি বললেন, সূর্যকে ধরে রাখ, তোমার সাথে কথা বলি।

সময়ের সাথে মানুষের অবহেলার আচরণ

(ইবনুল জাওযী র. আরও বলেন) আমি তো দেখি, প্রায় সকল মানুষই সময়ের সাথে বড় অবহেলার আচরণ করে, ঘোর উন্মাদনার সাথে এর অপচয় করে। যখন রাত বড় থাকে তখন তা কাটায় বেহুদা কথা-বার্তা ও আলাপ-আড্ডায় কিংবা প্রেম-প্রণয় বা গল্প গুজবের বই পড়ে। আর যখন দিন বড় থাকে তখন রাতটা তো ঘুমেই কাটিয়ে দেয়। আর দিনের এক বৃহৎ অংশ তারা দজলার পাড়ে বিনোদনে বা হাট-বাজারে অনর্থক কাটিয়ে দেয়। তাদের অবস্থাতো অকূল দরিয়ায় ভাসমান আরোহীদের মত, যারা বসে আড্ডায় মত্ত, তাদের না আছে গন্তব্যের চিন্তা আর না আছে পাথেয়ের ভাবনা।

জীবনকে মূল্যায়ন করে, অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে এবং শেষ সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে প্রস্তুত থাকে, এমন মানুষের সংখ্যা আজ অতি অল্প, প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা সময়ের পরিচয় অর্জন ও উপলব্ধি কর। হাতছাড়া হওয়ার আগে তার যথার্থ মূল্যায়ন কর। এ থেকে সর্বোচ্চ উপকার লাভের চেষ্টা কর। আমি তো বলতে চাই যে, তোমরা এর সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়। আর আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর, ইনশাআল্লাহ সফলতা আসবেই।

খেদমত ও সাক্ষাতের নামে সময়ের অপচয়

তিনি (ইবনুল জাওযী র.) বলেন, প্রায়ই আমি অনেক মানুষকে দেখি, অধিক মানুষের সাক্ষাত লাভের আশায় তারা দিন-রাত আমার সাথে ছোটা-ছুটি করে। আর একে তারা নাম দিয়েছে 'খেদমত'। কত দীর্ঘ সময় তারা অলস বসে থাকে! কত মানুষের কত রকম কথা তারা বলে! এমনকি কখনো গীবত ও পরচর্চায়ও লিপ্ত হয়ে পড়ে।[২৬]

কখনো এমনও দেখা যায় যে, লোকজন যার সাক্ষাতপ্রার্থী তিনিও এটা কামনা করেন এবং এতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আর নীরবতা ও

---

[২৬] আর এটাই স্বাভাবিক যে, অলস সময় যারা কাটায় এবং অযথা আলাপ চারিতায় লিপ্ত থাকে তারা এক সময় প্রতারণা ও পরনিন্দায় লিপ্ত হয়েই পড়ে।

একাকিত্বকে অপছন্দ করেন, এতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বিশেষ করে বিভিন্ন উৎসব বা ঈদের দিনগুলোতে, তখন তো তারা একে অপরের সাক্ষাতে যায়, একত্রে ঘুরতে বের হয়, এটাও যদি সালাম ও মোবারকবাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত তবে কথা ছিল, বরং তারা এতে বহু সময় নষ্ট করে, নির্দয়ের মত সময়ের অপচয় করে। হে আল্লাহ! এই অকর্মণ্য ও বেকার মানুষগুলো থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আমাকে এই বুঝ ও উপলব্ধি দান করেছেন যে, পৃথিবীতে সময় হল সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ এবং তাকে কল্যাণ কাজেই ব্যবহার করা আবশ্যক, তাই তাদের এ সমস্ত কার্যকলাপকে আমি অপছন্দ করি।

তবে তাদের সাথে আমার আচরণ হয় মধ্যপন্থী। কেননা, যদি তাদেরকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করি তবে সেটা তো আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা বা পরিচিতদেরকে দূরে ঠেলে দেয়ার নামান্তর হবে। আর তাদের এসব মেনে নিলে অমূল্য সময়-সম্পদ নষ্ট হবে। তাই আমি যথাসম্ভব দেখা-সাক্ষাতকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। যখন একান্তই বাধ্য হই, কথাকে খুবই সংক্ষিপ্ত করি যেন তাড়াতাড়ি এ পর্ব শেষ হয়ে যায়। অথবা এমন কিছু কাজ সবসময় প্রস্তুত রাখি যা করলেও সাক্ষাতকালে কথাবার্তায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। যেমন : কাগজ কাটা, কলম ঠিক করা, খাতা-পত্র বেঁধে রাখা; এগুলো তো আমাকে করতেই হয়, তবে চিন্তা-ভাবনা বা 'হুযূরে কালবে'র দরকার হয় না। ফলে সাক্ষাতেও আমার সময় নষ্ট হয় না, বেকার কাটে না।

সঠিক বুঝ তো শুধু ভাগ্যবানরাই লাভ করেন

দুনিয়াতে এমন মানুষ অনেক রয়েছে যারা প্রকৃতপক্ষে জীবনের অর্থই বোঝে না। এমন বহু লোককে আমি দেখেছি, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অঢেল ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা কামাই-রোযগার থেকে বে-নিয়ায করেছেন। তার পরও তারা সারাদিন বাজারে অলস বসে থাকে, লোকদের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর তাদের চারপাশে ঘটমান বিভিন্ন আপদ-বিপদ বা গর্হিত ও নিকৃষ্ট কাজ-কর্মের দর্শক হয়ে বসে থাকে।

তাদের কেউ কেউ তো দাবা-পাশা ইত্যাদি খেলায় ডুবে থাকে। কেউ তো গল্পগুজব ও আড্ডাবাজিতে দিন কাটায়; হয়ত রাজা বাদশাহদের অলীক ঘটনা বলবে কিংবা কোন মিথ্যা রটনা রটাবে অথবা জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির অনর্থক বর্ণনা দেবে। আমার তখন বুঝে আসে, জীবনের

মর্যাদার অনুভূতি এবং সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি অনেক বড় নিঅ'মাত, এ নিঅ'মাত সবাই প্রাপ্ত হয় না। শুধু আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক দেন, আর বুঝ ও উপলব্ধি দান করেন তারাই পায়।

আমরা শুধু আল্লাহর কাছে চাইতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে الذين أنعمت عليهم এর দলে শামিল করেন এবং তাদের পথে পরিচালিত করেন। আমীন।

(وما يُلقّاها إلا ذوحظّ عظيم আর মহা ভাগ্যবানই শুধু তা লাভ করতে পারে)

নিজের কথা গুণে রাখতেন যিনি

সালফে সালেহীন, তথা নেককার পূর্বসূরীগণ তো সময়ের ব্যাপারে সদা-সতর্ক থাকতেন, সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট থাকতেন। আর সজাগ থাকতেন, যেন একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয়।

ফুযায়ল ইবন ইয়ায বলেন, আমি তো এমন ব্যক্তি সম্পর্কেও জানি, যিনি সময় বাঁচানোর তাগাদায় এক জুম'আ থেকে পরের জুম'আ পর্যন্ত নিজের কথাগুলো গুণে রাখতেন। (হয়তবা পরবর্তী সপ্তাহে কথার পরিমাণ কমানোর জন্য এবং আমল ও কাজের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যই এই হিসাব। বাকী আল্লাহ ভাল জানেন। –অনুবাদক)

সময়ের হেফাযতে কৃত্রিমতা বর্জন

সময়ের হেফাযতের জন্য পূর্ববর্তীগণ লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকতেন। তাদের জীবনীতে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এক বুযুর্গের দরবারে কিছু লোক এল তাঁর সাক্ষাত প্রত্যাশায়। (কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে) তারা বলল, আমরা বোধহয় হযরতের কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম। তখন তিনি (নিঃসংকোচে) বললেন, সত্য বলতে কি, আমি একটি কিতাব মুতালা'আ করছিলাম, তোমাদের জন্য তা রেখে উঠে আসতে হল।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

এক বুযুর্গ 'সারীসাক্তী' এর কাছে এলেন। দেখতে পেলেন একদল লোক তার কাছে বসে আছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তো অলস ও

অকর্মণ্যদের আড্ডার স্থল হয়ে গেছো। একথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

মানুষ যার সাক্ষাতপ্রার্থী হয় তিনি যদি নরম মনের হন এবং কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেন তবে সেই সাক্ষাতপ্রার্থী আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে। বলা যায়, জেঁকে বসে। দীর্ঘ সময় ধরে তার কাছে পড়ে থাকে। তখন তো সাক্ষাত প্রার্থিত ব্যক্তি কোন না কোন অসুবিধার শিকার হনই।
মারূফ কারখী র. -এর দরবারে একদল লোক এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে রইল। অবশেষে তিনি (বিরক্ত হয়ে) বলেই ফেললেন, 'আল্লাহ তো সূর্যের গতিকে থামিয়ে দেননি; তাহলে তোমরা কখন উঠতে চাও?'

সময় বাঁচাতে রুটির পরিবর্তে ছাতু

দাঊদ আত্তায়ী র. সময় বাঁচাতে ছাতু গুলিয়ে তা পান করতেন। তিনি নিজেই তার কারণ বর্ণনা করে বলেন, 'ছাতু গিলে খাওয়া আর রুটি চিবিয়ে খাওয়ার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান সে সময়ে প্রায় পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করা যায়।'

খাওয়ার সময়টুকুও যাঁর কাছে কষ্টকর

উসমান বাকিল্লাভী র. অনেক বড় আবিদ ছিলেন। তিনি (একেবারে শাব্দিক অর্থেই) সবসময় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। তিনি বলতেন, খাওয়া দাওয়া ও ইফতারের সময়টুকু যিকির থেকে বিরত থাকার কারণে কষ্টে যেন আমার প্রাণ বের হয়ে যায়। তাই যথা সম্ভব দ্রুত আমি তা থেকে ফারেগ হয়ে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হই।

একাকী বাড়ী ফেরা

কোন কোন মনীষী তাঁর শাগরিদদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, তোমরা যখন দরস থেকে বের হবে তখন একাকী বাড়ী অভিমুখে চলবে। কেননা, একাকী হলে হয়ত তোমাদের কেউ তেলাওয়াত করতে করতে বাড়ী যাবে আবার কেউ ভাল কোন ভাবনায় সময়টা পার করবে। কিন্তু একত্রে থাকলে কথাবার্তা বলতে বলতেই সময়টা চলে যাবে।

প্রিয় পাঠক! এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। একটু সজাগ হও, সতর্ক হও। বুঝতে চেষ্টা কর, সময় কিন্তু হেলায় কাটানোর মত বা অপচয় করে নষ্ট করার মত স্বল্পমূল্যের কোন বস্তু নয়। সময় হল অমূল্য রত্ন। পৃথিবীর কোন কিছুই তার বিনিময় হতে পারে না।

একটি সহীহ হাদীছে আছে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

من قال سبحان الله العظيم وبحمده، غُرِسَتْ لَهُ بها نخلةٌ في الجنة

অর্থ : যে (একবার) বলবে, "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি" তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।[২৭]

তাহলে একটু ভেবে দেখ, প্রতিদিন কত সময় আমরা নষ্ট করছি। কত বিশাল ছাওয়াব আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

মূলত জীবনের দিনগুলো তো হল চাষ ক্ষেত্র। সুতরাং কোন জ্ঞানী লোকের জন্য কি এ সময়ে বীজ বপন না করে, তার প্রতি সজাগ ও সযত্ন না হয়ে অলস বসে থাকা উচিৎ?

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা সহজেই সময়ের হেফাযত ও মূল্যায়ন করতে পারি। যেমন, যথা সম্ভব একাকী ও নিঃসঙ্গ থাকা। (মানুষের সাথে) সাক্ষাতকালে শুধু সালাম ও গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যেই সাক্ষাতকে সংক্ষিপ্ত করা, আর কম খাদ্য গ্রহণ করা। কেননা, আহার বেশী হলে ঘুমও বেশী হবে! অলসতাও বাড়বে। ফলে রাত দিন কর্মহীনতায় কেটে যাবে।

পূর্বসূরীদের জীবনী ও গ্রন্থভাণ্ডার অধ্যয়ন

আমাদের পূর্বসূরীদের সবর ও হিম্মত এবং ধৈর্য ও সংকল্প ছিল অনেক উচ্চস্তরের। এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হল– তাঁদের সুবিশাল রচনা সম্ভার। যেগুলো তাঁদের জীবনকালে অর্জিত জ্ঞান ভাণ্ডারের সারনির্যাস। তাঁদের একেকজন এত অধিক পরিমাণে লিখেছেন এবং এমন ব্যাপ্ত গ্রন্থভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন, যা পর্বতসম মনোবল ও সমুদ্রসম অধ্যয়ন ব্যতীত কোনভাবেই সম্ভব নয়।

---

[২৭] জামে' তিরমিযী; ৫:১১৫

তবে আফসোসের বিষয় হল, তাদের সেই বিপুল গ্রন্থসম্ভার, সমৃদ্ধ জীবন ও সুব্যাপ্ত জ্ঞানের নির্যাস আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। বলা যায়, অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর মূল কারণ হল, বর্তমান ছাত্রদের প্রত্যয় ও মনোবলের অবস্থা।[২৮] যা আজ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আজ তারা সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততম কিতাবের প্রতি আগ্রহী। কত স্বল্প ও সীমিত অধ্যয়নে মূল বিষয়ে একটু জ্ঞান লাভ করতে পারে সে চিন্তায় ব্যস্ত। এতেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ গ্রন্থগুলি অধ্যয়নের সাহস করা তো বহু দূরের কথা।

তাদের অধঃপতন এটুকু হলেও না হয় কোন রকম মেনে নেয়া যেত। কিন্তু এখন তারা সেই মুখতাছার ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলোরও অংশ বিশেষ পড়ে; সম্পূর্ণ নয়। নির্দিষ্ট কয়েকটি অধ্যায় পড়ে মাত্র, কিংবা তারও অংশ বিশেষ। যার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যুগের পর যুগ ছাত্রদের অবস্থানুপাতে কিতাব সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়ে চলেছে। ফলে পূর্বসূরীদের সেই সব গ্রন্থভাণ্ডার আজ বিলুপ্ত প্রায়। যৎসামান্য আছে তা-ও কোন সংরক্ষিত গ্রন্থশালার কাচের বেষ্টনিতে দর্শনীয় বস্তু হয়ে।

এখন যদি কোন তালিবে ইলম নিজের ইলমী উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং উৎকর্ষ অর্জন করতে চায় তবে তার কাজ হবে, পূর্ববর্তী মনীষীগণের সেই গ্রন্থসম্ভার অন্বেষণ করা, বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় কিতাবগুলো খুঁজে বের করা এবং অধিক থেকে অধিকতর অধ্যয়নে মগ্ন ও নিমগ্ন থাকা। তখনই সে মনীষীগণের জ্ঞানের গভীরতা ও মনোবলের উচ্চতা উপলব্ধি করতে পারবে, যা তার চিন্তা-চেতনাকে শাণিত করবে, হৃদয় ও আত্মাকে আন্দোলিত করবে এবং এপথের মেহনত ও মুজাহাদায় এবং চেষ্টা ও সাধনায় তাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

বর্তমানে আমরা যাদের দেখি এবং যাদের সাথে চলাফেরা করি তাদের আচরণ ও উচ্চারণ এবং জীবন বৃত্তান্ত থেকে আমি নিজেও আল্লাহর আশ্রয় চাই। তাদের মাঝে না আছে দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চ মনোবল, যার অনুসরণে তালেবে ইলমগণ ফায়দা হাসিল করতে পারে। আর না আছে তাকওয়া ও পরহেযগারী, যা থেকে দুনিয়া-বিমুখ আবেদ উপকৃত হতে পারে।

তাই আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তী মনীষীগণের জীবনী পাঠ কর, তাঁদের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন কর। কেননা, তাঁদের কিতাবগুলো

---

[২৮] যা মূলত তলব বা অন্বেষার দুর্বলতারই নামান্তর।

অধিক হারে অধ্যয়ন করা তাঁদেরকে দেখারই নামান্তর। তাইতো কবি বলেন,

فاتنِی أن أری الدیار بطرفی ✪ فلعلّی أری الدیار بسمعی

সেসব গৃহনিবাস আমার চোখে দেখা হয়নি,
হয়তোবা শ্রবণ দ্বারাই আমি তার দর্শন পাব।[২৯]

মুতালা'আয় অতৃপ্ত

ইবনুল জাওযী র. বলেন, "এবার আমি আমার নিজের অবস্থার কিছুটা বর্ণনা দিই। কিতাব মুতালা'আয় আমি কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারি না। কখনো এমন মনে হয় না যে, অনেক হয়েছে, আর লাগবে না। যখনই আমি এমন কোন কিতাব দেখি, যা আগে দেখিনি তখন মনে হয় আমি যেন কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছি।

মাদরাসায়ে নেযামিয়ার পাঠাগারে (যা ছিল তৎকালীন বাগদাদের সবচে' বড় গ্রন্থাগার) সংরক্ষিত কিতাবের তালিকা দেখলাম। সেখানে প্রায় ছয় হাজার গ্রন্থের নাম উল্লেখ ছিল। আবার ইমাম আবু হানীফা, হুমাইদী, আবদুল ওয়াহহাব আনমাতী, ইবন নাসির ও আবু মুহাম্মাদ আল-খাসসাব র. এর কিতাবের তালিকাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সেগুলোতেও ছিল অগণিত নাম। এগুলো ছাড়া আরও যত গ্রন্থ ছিল সব আমার মুতালা'আ হয়ে গেছে। যদি বলি, আমি এ যাবৎ বিশ হাজার কিতাব মুতালা'আ করেছি, তবে অত্যুক্তি হবে না। এরপরও আমার শুধু পড়তেই মন চায়, তলবেরই শওক হয়।

মনীষীগণের জীবন-চরিত, তাদের ছবর ও হিম্মত এবং ইবাদত ও বন্দেগীর কথা, আর আশ্চর্য সব জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে এমন কিছু আমি লাভ করেছি, যা বলে বুঝানো যায় না। শুধু তারাই তা বুঝতে পারবে এবং উপলব্ধি করতে পারবে যারা এসব অধ্যয়ন করেছে।

আজ মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে এবং ছাত্রদের হিম্মত ও মনোবল যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, আমার কাছে তা অতি নিম্ন স্তরের ও সাধারণ পর্যায়ের মনে হয়, মনে হয় তা জাতির পতন ও অধঃপতন। (ولله الحمد انتهى)

---

২৯ অর্থাৎ, তাদের বাড়ী-ঘরের বর্ণনা শোনার দ্বারা কল্পনায় হলেও তা আমার দেখা হয়ে যাবে।

জীবন তো কতক শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি

ইমাম ইবুনল জাওযী র. لفتة الكبد فى نصيحة الولد নামক একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন। যার মাধ্যমে তিনি তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদান করেন। বিশেষত সময় সচেতনতার ব্যাপারে সতর্ক করেন। তাতে লিখেন, "প্রিয় বৎস! জেনে রাখ, জীবনের দিনগুলো তো কিছু সময়ের সমষ্টি, আর সময়গুলো হল কতক শ্বাস-প্রশ্বাসের যোগফল। আর প্রতিটি শ্বাস হল তোমার জন্য একেকটি কোষাগারের মত। তাই তুমি সতর্ক থেকো, শ্বাস পরিমাণ সময়ও যেন তোমার কর্মহীন না কাটে। তোমার এই কোষাগার যেন শূন্য রয়ে না যায় এবং বিরান ঘর হয়ে পড়ে না থাকে। অন্যথায় হাশরের ময়দানে, মহান বিচারকের সামনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া ছাড়া এবং আফসোস করা ছাড়া তোমার আর কোন উপায় থাকবে না।
জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্তের দিকে তুমি লক্ষ রাখ, কোন কাজে তুমি তা ব্যয় করছ! কোন জিনিস তুমি তাতে গচ্ছিত রাখছ! তাতে সাধ্যমত সর্বোত্তম জিনিসই গচ্ছিত রেখো এবং সর্বোত্তম কাজেই তুমি তা ব্যয় করো। তুমি নিজেকে এবং নিজের জীবনকে অবহেলা করো না। তাকে তুমি সবচে' সুন্দর ও সর্বোৎকৃষ্ট কাজে অভ্যস্ত করে তোল। আর কবরের সেই কুটিরে, সেই 'সিন্দুকে' এমন কিছু আগেই পাঠিয়ে দাও, যা তোমাকে আনন্দিত করবে সে দিন, যে দিন সেখানে তোমাকে রাখা হবে।

দিনে প্রায় ৪০ পাতা লিখতেন যিনি

হাফেয ইবন রজব র. তাঁর ذيل طبقات الحنابلة নামক গ্রন্থে ইবনুল জাওযী র. এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, "এমন কোন শাস্ত্র বা বিষয় নেই যাতে তিনি কলম ধরেননি এবং তাছনীফ করেননি। তার সংকলিত গ্রন্থসংখ্যা তিনশ' চল্লিশেরও উর্ধ্বে, তাতে যেমনি আছে দশ-বিশ খণ্ডের কিতাব, তেমনি আছে ছোট পুস্তিকাও।
মুয়াফ্ফাক আবদুল লতীফ বলেন, "ইবনুল জাওযী র. একটি মুহূর্তও অনর্থক কাটাতেন না। একটু সময়ও নষ্ট করতেন না। দিনে প্রায় চার কুর্রাসা[৩০] বা চারটি পুস্তিকা লিখতেন। প্রতি বছরই তাঁর লেখার পরিমাণ পঞ্চাশ থেকে ষাট জিলদ বা খণ্ড হত।

---

[৩০] কুর্রাসা বলা হয় প্রায় দশ পাতা সম্বলিত ছোট গ্রন্থকে।

প্রায় দু'হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন যিনি

تذكرة الحفاظ গ্রন্থে হাফেয যাহাবী এবং ذيل طبقات الحنابلة গ্রন্থে ইবন রজব উল্লেখ করেন, আল্লামা ইবনুল জাওযীর দৌহিত্র আবুল মুজাফফার বলেন– "নানাজানকে আমি শেষ বয়সে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি, "আমি এই দুই আঙ্গুলে (প্রায়) দু'হাজার খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছি।"

ইবনুল ওয়ারদি র. তাঁর تتمة المختصر في أخبار البشر গ্রন্থে লিখেন "কথিত রয়েছে যে, তিনি (আবুল মুজাফফার) আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযীর লিখিত সবগুলো পুস্তিকা একত্রিত করে তারপর তাঁর জীবনের দিনগুলো হিসাব করে দেখেন যে, গড়ে প্রতিদিন নয়টি পুস্তিকা (প্রায় ৯০ পাতা) লেখা হয়েছে।

কলম-চাঁছা দিয়ে শেষ গোসলের পানি গরম

الكُنى والألقاب নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবনুল জাওযী র. যে সকল কলম দিয়ে শুধু হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লিপিবদ্ধ করতেন সেগুলোর (মাথার দিকের) কর্তিত অংশগুলোকে জমিয়ে রাখা হত। প্রায় এক বোঝা হয়ে গিয়েছিল সেগুলো। মৃত্যুপূর্বে তিনি অসিয়ত করে গিয়েছেন, তাঁর শেষ গোসলের পানি যেন এগুলো দিয়ে গরম করা হয়। ঠিক তাই করা হল। সেগুলো পরিমাণে এত অধিক ছিল যে, অতিদ্রুত ভস্মীভূত হওয়া সত্ত্বেও গোসলের সম্পূর্ণ পানি গরম করার পরও অনেকখানিই অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল।[৩১]

আল্লাহু আকবার! কী পরিমাণ কলমী খেদমত তাঁরা করে গেছেন!

[৩১] আগে লোকেরা বাঁশ বা কাঠের কলম বানাত এবং সেগুলো কালিতে চুবিয়ে চুবিয়ে লিখত। যখন মাথা ভোঁতা হয়ে যেত– খুব পাতলা করে পেন্সিল চাঁছার মত করে– চেঁছে দেয়া হত।

জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় যাঁর কলমের অবদান

ইরাকের অধিবাসী অধ্যাপক আবদুল হামীদ আ'লুজী একটি গ্রন্থ রচনা করেন مؤلّفات ابن الجوزى নামে। এতে তিনি ইবনুল জাওযীর সংকলনগুলোর নাম উল্লেখ করেন, ছোট বড় সব মিলিয়ে যার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১৯।

এরপর তিনি লিখেন, এছাড়াও অনেক গ্রন্থ ও গ্রন্থের নাম তার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

এই কিতাবের ভূমিকায় রয়েছে, আল্লামা ইবন তাইমিয়্যা র. তাঁর أجوبته المصريّة গ্রন্থে লিখেন, "শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী র. বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি আমি তাঁর যে সকল গ্রন্থ দেখেছি এবং সন্ধান পেয়েছি তার সংখ্যাই প্রায় হাজারের উপরে। আর আমার না দেখা যে কত রয়ে গেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে আমি এতটুকু বলতে পরি যে, এই সংখ্যা উল্লেখের পরও আমি তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ দেখেছি।"

হাফেয যাহাবী র. তাঁর تذكرة الحفاظ নামক গ্রন্থে ইবনুল জাওযীর অনেকগুলো সংকলনের নাম উল্লেখের পর বলেন, "এমন কোন আলেম সম্পর্কে আমার জানা নেই, যিনি তাঁর মত এত অধিক কিতাব লিখেছেন। এরপর তিনি মুয়াফ্ফাক আবদুল লতীফ এর কথা উল্লেখ করেন যে, "ইবনুল জাওযী একটি মুহূর্তও নষ্ট করতেন না। অধ্যাপনা, গ্রন্থসংকলন ও ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন প্রায় চল্লিশ পাতা লিখতেন।

আর নির্দ্বিধায় বলা যায়– 'জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায়, প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর ও তাঁর কলমের অংশগ্রহণ বরং বিশাল অবদান রয়েছে।'

আবু তাহের সিলাফী সম্পর্কে শত খণ্ড

تذكرة الحفاظ গ্রন্থে হাফেয আবদুল গনি আল-মাকদিসী র. এর (৫৪১-৬০০ হিজরী) জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, "তিনি ছিলেন দামেস্কের অধিবাসী, হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এবং হাদীছ শাস্ত্রের একজন ইমাম। তিনি বহু গ্রন্থ সংকলন করেছেন। শুধু আবু তাহের সিলাফী সম্পর্কেই শত

খণ্ড (প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠা) লিখেছেন। এছাড়াও তাঁর বহু রচনা ও সংকলন রয়েছে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি রচনা, সংকলন, অনুলিপি লিখন, হাদীছের দরস প্রদান ও ইবাদত-বন্দেগীতে সময় ব্যয় করেছেন।

তাঁর শাগরেদ যিয়া মাকদিসী বলেন, "তিনি এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতেন না। ফজরের নামাযের পর কোরআন শিক্ষা দিতেন। কখনো কখনো হাদীছের দরসও প্রদান করতেন। এরপর অজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। সূরা ফাতেহা এবং সূরা ফালাক ও নাস দিয়ে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় তিনশ' রাকাত নামায পড়তেন। এরপর অল্প সময় ঘুমাতেন। যোহরের পর হাদীছ শ্রবণ, লেখা-লেখি ও অনুলিপি তৈরীতে ব্যস্ত থাকতেন। একাজ চলত প্রায় মাগরিব পর্যন্ত। এরপর রোযা রেখে থাকলে ইফতার করতেন।

এশার পর থেকে অর্ধরাত বা এর কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত ঘুমাতেন। এরপর তিনি একটু পরপর অজু করে নামাযে দাঁড়াতেন। কোন কোন দিন এ সময়ের ভিতর সাত আট বার পর্যন্ত অযু করতেন। আর বলতেন, অজুর পানিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতক্ষণ আর্দ্র থাকে ততক্ষণ আমার ভালো লাগে।

এরপর ফজরের পূর্বে অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। এটাই ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। "তিনি চল্লিশের অধিক কিতাব রচনা করেছেন। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল[৩২] النّفائس الغَوالى

খাওয়ার সময়টুকুর জন্য আফসোস

عُيون الأنباء فى طبقات الأطبَّاء গ্রন্থে লেখক ইবন আবি উছাইবিয়া ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. এর জীবনী আলোচনা করে লিখেন– "তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তাফসীর বিশারদ, নীতি-শাস্ত্রবিদ, আইনবিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ বিন উমর', জন্ম ৫৪৩ এবং মৃত্যু ৬০৬ হিরজীতে। ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময়ে প্রায় দু'শরও অধিক কিতাব লিখেছেন তিনি। এর কোন কোনটি বিশ-ত্রিশ খণ্ডের।

তাঁর জীবনীর আরেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফখরুদ্দীন রাযী বলেছেন, "খাওয়ার সময়টুকুর জন্য আমার খুব আফসোস হয় যে, এই

---

৩২. তাঁর কর্মময় জীবনের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ইবন রজব এর ذيل طبقات الحنابلة গ্রন্থে। আগ্রহী পাঠক চাইলে দেখে নিতে পারেন। (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫-৩৫)

সময়টা ইলমী মগ্নতা ছাড়া কেটে যায়। আহা! সময়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সময়তো অনেক মূল্যবান!"

'মাফখারুল ইরাক'

ইতিহাসবিদ ইবন নাজ্জার ذيل تاريخ بغداد গ্রন্থে তাঁর শায়খ ইবন সুকায়না র. এর জীবনী আলোচনা করতঃ লিখেন "শায়খুল ইসলাম যিয়াউদ্দিন আবু আহমদ আবদুল ওয়াহহাব বিন আলী ইবন সুকায়না (৫১৯-৬০৭ হিজরী) ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী, শাফেয়ী' মাযহাবপন্থী একজন সুফি সাধক। তিনি ছিলেন ফকীহ ও মুহাদ্দিছ এবং সে যুগের লোকদের, বিশেষত আলেমদের জন্য আদর্শ ও নমুনা। তাকে 'শায়খুল ইসলাম' ও 'মাফখারুল ইরাক' (ইরাকের গৌরব) বলা হত। এক কথায়, সনদ ও ইতকান, যুহদ ও ইবাদত, তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং এত্তেবায়ে সুন্নত ও পূর্বসূরীদের পথ ও পন্থা অনুসরণে তথা সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শায়খ ও পথিকৃৎ।

আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ জীবন এবং ব্যাপ্ত যশ-খ্যাতি দান করেছিলেন। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে তালিবে ইলমরা তাঁর কাছে আসতো। দীর্ঘায়ুর সুবাদে তিনি তার বর্ণিত সকল হাদীছ বহুবার বর্ণনা করার এবং এর মাধ্যমে বহু হাদীছ পিপাসুকে পরিতৃপ্ত করার তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছেন।

সময়ের হেফাযতের প্রতি তিনি অতি যত্নবান ছিলেন এবং খুব হিসাব করে কথা বলতেন। যেন অনর্থক কথায় সময় নষ্ট না হয়। দিন-রাত তাঁর সময় কাটতো কোরআন তেলাওয়াতে কিংবা যিকির-তাহাজ্জুদে অথবা কোরআন ও হাদীছ শ্রবণে ও তার দরস প্রদানে।

তাঁর মজলিসে অনর্থক ও অহেতুক কথাবার্তা, গীবত-শেকায়াত নিষিদ্ধ ছিল। নামাযের জামাতে বা কারও জানাযায় শরীক হওয়ার তাগাদা ছাড়া তিনি কখনও বাইরে বের হতেন না। দেখা-সাক্ষাত কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষেও তিনি কোন বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালীদের ঘরে বা মজলিসে উপস্থিত হতেন না।

ইবন নাজ্জার বলেন– "প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে আমার বহু সফর হয়েছে, বহু অঞ্চল আমার দেখা হয়েছে। অগণিত লোকদের সাথে আমার উঠাবসা ও কথাবার্তা হয়েছে। বহু আলেম ও যাহেদকে কাছে ও দূরে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তবে একথা আমি হলফ করে বলতে পারি, তাঁর (ইবন

সুকায়নার) চেয়ে অধিক ইবাদাতগুযার, সুন্দর পথ ও পন্থার অধিকারী এবং পূর্ণতর ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। আর এ মন্তব্য আমি এমনি এমনি করছি না। তাঁর কাছে প্রায় ত্রিশ বছর কাটিয়েছি আমি। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর খুব কাছাকাছি থেকেছি। তাঁর থেকে আদব-আখলাক ও শিষ্টাচার শিখেছি। সকল কেরাতে তাঁকে কোরআন শুনিয়েছি। তাঁর থেকেই আমি সর্বাধিক হাদীছ শুনেছি এবং দীর্ঘ কলেবরের কিতাবাদি পড়েছি।

কৃত্রিমতা বর্জনের অনন্য দৃষ্টান্ত

বাগদাদের সর্ববৃহৎ ও সর্বোন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "মাদরাসায়ে নেযামিয়া" এর শিক্ষক ইয়াহইয়া বিন কাসিম বলেন, ইবন সুকায়না র. এর যেমনি ছিল ইলম, তেমনি ছিল তদানুযায়ী আমল। এক কথায় তিনি ছিলেন আলেমে বা-আমল। একটি মুহূর্তও তিনি নষ্ট করতেন না। যখন আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতাম তিনি বলতেন– لاَتَزِيدوا على سلامٌ عليكم مسألة (তোমরা সালাম দেয়ার পর আর কোন কুশল প্রশ্ন করো না)। শুধু সময়ের হেফাযতের জন্য এবং ইলমী আলোচনায় অতি আগ্রহের জন্যই তিনি তা করতেন।

আল্লাহু আকবার! কী আশ্চর্য বিষয়! কী বিস্ময়কর অবস্থা!! সাক্ষাৎপ্রার্থীকে শুধু সালামেই সীমাবদ্ধ থাকতে বলা, সাক্ষাতের সৌজন্য-ভদ্রতার লৌকিকতা পরিহার করা এবং সালামের পরপরই ইলমী আলোচনা বা অধ্যয়নে মগ্ন হতে বলা! আহ! কতইনা কঠিনভাবে সময়ের মূল্যায়ন করতেন তাঁরা! কী বুঝ, কী উপলব্ধি আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁদের! কোথায় আজ খুঁজে পাব এর দৃষ্টান্ত, কিংবা নিকটতর নমুনা?

প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময়টুকুও যেন অনর্থক না কাটে

বিস্ময়করভাবে যাঁরা সময়ের হেফাযত করতেন, কল্পনাতীত পন্থায় যাঁরা সময়কে কাজে লাগিয়ে যেতেন তাঁদের অন্যতম হলেন ইমাম ইবন তাইমিয়্যা র.। তার পুরো নাম হল– 'মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম বিন আবদুল্লাহ বিন তাইমিয়্যা' জন্ম ৫৯০ হিজরীর শেষ দিকে এবং মৃত্যু- ৬৫৩ হিজরীতে।

হাফেয ইবন রজব (ذيل طبقات الحنابلة) গ্রন্থে তাঁর জীবনীতে লিখেন, "তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, ক্বারী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির এবং নাহ্বিদ

ও নীতি শাস্ত্রবিদ। তাঁকে শায়খুল ইসলাম ও ফকীহুয্ যামান (যামানার সেরা ফকীহ) বলা হতো।

আমাদের শায়খ আবু আবদুল্লাহ ইবনুল কাইয়্যিম বলেন– "ইবন তাইমিয়্যা র. এর পৌত্র বর্ণনা করেন, "আমার দাদা-মজদুদ্দীন আবুল বারাকাত- যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যেতেন তখন আমাকে বলতেন, এই কিতাবটি পড় এবং এতটা জোরে পড় যেন আমি শুনতে পাই। এতে সময়টুকু আমার অনর্থক কাটবে না।"

ইবন রজব বলেন, "ইলমের প্রতি আগ্রহের এবং সময়ের ব্যাপারে সচেতনতার এরচে' বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে!"

সারারাত তিনি ইলম চর্চায় নিবিষ্ট থাকতেন

ইমাম নববী র. (بستان العارفين) গ্রন্থের শেষ দিকে (باب فى حكايات مستطرفة) শিরোনামে যুগশ্রেষ্ঠ ও অনন্য সাধারণ কতক আলেমের কিছু কীর্তি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি হাফেয আবদুল আযীয আল-মুনযীরী র. (৫৮১-৬৫৬) এর একটি সুকীর্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি আমার শায়খ যিয়াউদ্দিন আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন ঈসা কে (৬৫৮ হিজরীর ৬ শাওয়াল রোজ বুধবার দামেস্কের এক মাদরাসায়) একথা বলতে শুনেছি যে, শায়খ আবদুল আযীয র. বলেছেন, "নিজ হাতে আমি নব্বই মুজাল্লাদ (বা খণ্ড) কিতাব এবং সাতশ' জুয্ (তথা, প্রায় ২১০০০ পৃষ্ঠা) লিখেছি।"

এর সবগুলোই উলূমুল হাদীছ সম্পর্কিত অন্যদের রচনা। আর এসব ছাড়াও তাঁর নিজের লেখা, নিজের রচনাও অনেক। তিনি আরও বলেন, ইলম চর্চায় তাঁর মত এত বেশী শ্রম-সাধনা করতে, এত বেশী মগ্ন থাকতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

কায়রোর এক মাদরাসায় আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম প্রায় বার বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে এমন কোন রাত এবং রাতের এমন কোন মুহূর্ত কাটেনি, যখন আমি জাগ্রত হয়েছি, আর দেখেছি তাঁর ঘরের বাতি নিভানো। বরং সারারাত তাঁর ঘরে বাতি জ্বলতো আর তিনি ইলম চর্চায় নিবিষ্ট থাকতেন। এমন কি খাওয়ার সময়টুকুতেও দেখতাম তাঁর পাশে কিতাব, আর তিনি তাতে মগ্ন। তাঁর ইলমী তাহকীক ও বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা এমন ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ প্রায় অসম্ভব। তবে এতটুকু বলা

যায়, তিনি কোন উৎসবে, অনুষ্ঠানে বা ছুটিতে মাদরাসা থেকে বের হতেন না। শুধু জুম'আর জন্যই বের হতেন। এছাড়া সব সময়ই তিনি ইলমের মাঝে মগ্ন ও নিমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। আমীন।

সন্তানের মৃত্যুতেও মাদরাসা থেকে বের হননি যিনি

ইমাম তাজউদ্দিন সুবকী طبقات الشافعية الكبرى গ্রন্থে হাফেয মুনযিরী র. এর জীবনীতে লিখেন, "শেষ জীবনে তিনি উচ্চতর বিভাগে হাদীছের দরস দিতেন। শুধু জুম'আর নামায ছাড়া কখনো তিনি মাদরাসা থেকে বের হতেন না। রশিদ উদ্দিন আবু বকর মুহাম্মাদ নামে তাঁর এক ছেলে ছিল। তিনিও ছিলেন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছ এবং অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান আলিম। পিতার জীবদ্দশাতেই আল্লাহ এই ছেলেকে নিয়ে গেলেন। (হয়ত তাঁর এই বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য এবং বহুগুণ মর্যাদা ও মর্তবা বৃদ্ধির জন্য কিংবা হয়ত অন্য কিছুর জন্য! আল্লাহর হেকমত বোঝার সাধ্য কার আছে, তিনি যাকে বোঝান সে ছাড়া!) ৬৪৩ হিজরীতে তিনি (রশীদ উদ্দীন) ইন্তেকাল করলেন। শায়খ মুনযীরী মাদরাসার ভিতরেই তাঁর জানাযা পড়লেন। এরপর দরজা পর্যন্ত, শুধু মাদরাসার দরজা পর্যন্ত এগিয়েই তাকে বিদায়, চির-বিদায় জানালেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে শুধু বললেন– "আল্লাহর হাতে তোমাকে সঁপে দিলাম।" এটুকু বলেই তিনি চলে এলেন; মাদরাসার সীমানা থেকে বের হননি।

মৃত্যুর দিনও কবিতা পঙ্‌ক্তি মুখস্থকরণ

বিশিষ্ট ইমামদের মধ্যে যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যায়ন করেছেন, এমনকি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও যারা ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত থেকেছেন, তাদের একজন হলেন আরবী ব্যাকরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিতাব الألفية এর লেখক, ইমাম ইবন মালেক মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (৬০০-৬৭২ হিজরী)।

نفح الطيب গ্রন্থে তাঁর জীবনী সংকলক উল্লেখ করেন– "তিনি অত্যধিক মুতালা'আ করতেন এবং যে কোন কিছু লেখার আগে বারবার পুনপঠন ও পুননিরীক্ষণ করতেন। অতি নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারীদের মত যেকোন বিষয় মূল থেকে যাচাই না করে সে বিষয়ে কলম ধরতেন না। সারাদিন

সময়কে তিনি এতটাই হেফাযত করতেন যে, যখনই তাঁকে দেখা হত, হয়ত তিনি নামায পড়ছেন বা তেলাওয়াত করছেন কিংবা কিছু লিখছেন বা পড়ছেন।

একবার তিনি তাঁর কতক শাগরিদসহ দামেস্ক সফরে গেলেন। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যখন তারা গন্তব্যে পৌছলেন, তখন সাথীরা আপন আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ফলে কিছুক্ষণের জন্য তারা তাঁর কথা ভুলে গেলেন। পরে যখন তারা তাঁকে খুঁজলেন, পেলেন না। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে পাওয়া গেল এবং দেখা গেল, কয়েকটি পৃষ্ঠার দিকে তিনি ঝুঁকে আছেন। নিবিষ্টচিত্তে মুতালা'আ করছেন।

আমি সবচে' আশ্চর্য হই, ইলমের প্রতি তাঁর গুরুত্বারোপ ও মনোযোগের এই ঘটনা থেকে যে, মৃত্যুর দিনও তিনি কতগুলো পঙ্ক্তি মুখস্থ করছিলেন। অসুস্থতার কারণে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর ছেলে সেগুলো তাঁকে বলে দিচ্ছিলেন আর তিনি মুখস্থ করছিলেন। কারো কারো মতে তিনি সেদিন আটটি পঙ্ক্তি মুখস্থ করেছিলেন। এ যেন এই (আরবী) প্রবাদের বাস্তব নমুনা–

بِقَدْرِ ماتتعنّىٰ تنال ما تتمنّى–

অর্থ : যতটুকু কষ্ট সইবে, (আকাঙ্ক্ষালাভে) ততটুকুই সফলতা পাবে।

তিনি ৬৭২ হিজরীতে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন, কাসিয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে তাঁকে দাফন করা হয়। এখনো তাঁর কবর সেখানে চিহ্নিত আছে।" আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন (আমীন)।

প্রায় দু'বছর যাঁর পিঠ যমিনের স্পর্শ পায়নি

হাফেয যাহাবী تذكرة الحفاظ গ্রন্থে ইমাম নববী র. এর জীবনীতে লিখেন, "তাঁর নাম ইয়াহইয়া ইবন শারাফ ইবন মুররি। উপনাম মুহয়ূদ্দিন আবু যাকারিয়্যা। তিনি শায়খুল ইসলাম ও 'আলামুল আওলিয়া (ওলীগণের ঝাণ্ডা) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর জন্ম ৬৩১ হিজরীতে হাওরান এলাকার নাওয়া নামক জনপদে। ১৮ বছর বয়সে ৬৪৯ হিজরীতে তিনি দামেস্কে আগমন করেন এবং 'মাদরাসায়ে রাওয়াহিয়্যা'য় অবস্থান গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল যাবৎ মাদরাসা-প্রদত্ত রুটিই ছিল তাঁর একমাত্র আহার।

তিনি (ইমাম নববী র.) বলেন, "প্রায় দু'বছর আমার এভাবে কেটেছে যে, আমার পিঠ যমিনের (বিছানার/শয্যার) স্পর্শ পায়নি।"

এই সময়ে তিনি সাড়ে চার মাসে التنبيه মুখস্থ করেছেন আর বাকী সময়ে المهذّب গ্রন্থের এক চতুর্থাংশ তাঁর শায়খ ইসহাক বিন আহমদ র. এর কাছে পড়েছেন এবং মুখস্থ করেছেন।

ইমাম নববীর শাগরেদ, আমাদের শায়খ আবুল হাসান বিন আত্তার র. বলেছেন, "শায়খ মুহয়ুদ্দিন প্রতিদিন তাঁর উস্তাযগণের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বারটি দরস গ্রহণ করতেন। উলূমুল ফিকহে الوسيط গ্রন্থ থেকে দু'দরস, ফিকহে المهذّب থেকে এক দরস, সহীহায়ন থেকে উলূমুল হাদীছ বিষয়ে এক দরস, এছাড়া সহীহ মুসলিম থেকে, আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইবনে জিন্নি'র اللمع গ্রন্থ থেকে, ভাষা শাস্ত্রে إصلاح المنطق থেকে, ছরফ শাস্ত্র থেকে, উসূলে ফিকহ থেকে, কখনো আবু ইসহাক এর اللمّع গ্রন্থ থেকে, আবার কখনো ফখরুদ্দীন রাযী এর المنتخب থেকে এবং আসমাউর রিযাল থেকে উসূলে দ্বীন থেকে, এবং নাহবশাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র একটি করে দরস।

তিনি (ইমাম নববী র.) বলেন, "আমার এ সকল দরসের সাথে সম্পৃক্ত যত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা থাকত সব আমি নোট করে রাখতাম"।

দিনে-রাতে শুধু একবেলা খাবার গ্রহণ

আবুল হাসান ইবনুল আত্তার আরও বলেন, শায়খ (ইমাম নববী) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতেন না। দিনে বল বা রাতে, সব সময় তিনি পড়ালেখায় মগ্ন থাকতেন। এমনকি পথ চলার সময়ও তিনি হয় একাকী অধ্যয়ন করতেন অথবা কারও সাথে ইলমী আলোচনা করতেন। এটাকে তিনি প্রায় অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ অবস্থায় কাটল প্রায় ছ'বছর। এরপর তিনি কিতাব রচনা, অধ্যাপনা ও ওয়াজ-নসিহতের পথে অগ্রসর হলেন। তখনও তিনি এমনভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টায় শুধু ইশার পর এক বেলা খাবার গ্রহণ করতেন এবং সেহরীর সময় তরল কিছু পান করে নিতেন। আড়ম্বরপূর্ণ খাবার কিংবা ফলমূল তিনি খেতেন না। বলতেন, এতে দেহে

অলসতা ঠাঁই পাবে এবং ঘুম বেশী হবে। এমনকি সময়ের হেফাযতের জন্য তিনি বিবাহ থেকেও বিরত থেকেছেন।

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। পানাহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি নিজের প্রতি– বলতে হয়– কঠোরতা করতেন। নিয়মিত ইলমী ব্যস্ততা, তাদরীস, তাছনীফ, ইবাদত-বন্দেগী ও ওযীফা আদায় এবং লাগাতার রোযা রাখা সত্ত্বেও তার খাবার-দাবার ছিল অতি সাধারণ। পোশাক ছিল সস্তা ও সাধারণ কাপড়ের, আর পাগড়ী ছিল (সহজলভ্য) ছাগলের পাকা চামড়া।

তিনি ৬৭৬ হিজরীতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এই স্বল্প হায়াত সত্ত্বেও তিনি স্বরচিত বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার রেখে যান। পরবর্তীতে তাঁর রচিত কিতাবের পাতা ও জীবনের 'খাতা' হিসাব করে দেখা যায় গড়ে তিনি প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পাতা লিখেছেন।

বিজ্ঞ আলেম এবং দক্ষ চিকিৎসক

যে সকল অনন্য সাধারণ ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদের জ্ঞান ও চিন্তার সারনির্যাস আশ্চর্যরকম অল্প সময়ে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, তাদের অন্যতম হলেন ইবন নাফীছ দামেস্কী, যিনি একদিকে যেমন ছিলেন বিজ্ঞ আলেম তেমনি ছিলেন দক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানী। এমনকি তাঁকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

روضات الجنات গ্রন্থে লেখক তাঁর জীবনী আলোচনা করতঃ উল্লেখ করেন- "তার পূর্ণ নাম হল, আলাউদ্দিন ইবন নাফীছ আলী ইবন আবু হাযম। জন্ম ৬১০ এবং মৃত্যু ৬৮৭ হিজরীতে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। গবেষণা ও উদ্ভাবনে এ শাস্ত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, এমন কি ধারে কাছেও কেউ নেই। এ শাস্ত্রে তাঁর রয়েছে বেশকিছু চমৎকার গ্রন্থ এবং অনবদ্য সংকলন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত الشامل গ্রন্থটি। কিতাবটি সম্পর্কে তাঁর কতক শাগরিদ বলেন, এর সূচী প্রমাণ করে যে, এটি প্রায় তিনশ' খণ্ডের, এর মধ্যে পরিচ্ছন্নভাবে লেখা হয়েছে মাত্র আশিখণ্ড। তাঁর রচনার মধ্যে আরো রয়েছে المهذّب في الكُحل এবং ইবন সীনা কৃত 'আলকানূনে'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ شرح القانون এগুলোও বহু খণ্ডের। এছাড়াও এ শাস্ত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়াও বহু বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ছিল। তর্কশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, উসূলে ফিকহ, হাদীছ, অলংকার শাস্ত্র ও আরবী ভাষাতত্ত্বেও ছিল যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি এবং এসকল শাস্ত্রেই তিনি কলম চালিয়েছেন– অতি দক্ষ হাতে, সফলতার সাথে। এতসব কিছু তিনি করেছেন– কায়রোর মাদরাসায়ে মাসরূরীয়্যায় ফিকহ অধ্যাপনার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে।

ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম রশীদ বলেন, আলা ইবন নাফীছ যখন কোন গ্রন্থরচনার সংকল্প করতেন তখন অনেকগুলো কলম চেঁছে প্রস্তুত করে কোন প্রাচীর বা আড়ালের দিকে মুখ করে বসতেন এবং মন থেকে উৎসারিত জ্ঞান-নির্যাস ও চিন্তার ফলগুলো সংরক্ষণ শুরু করতেন। প্রবলবেগে প্রবাহিত ঢলের গতিতে তাঁর কলম চলত। একটি ভোঁতা হয়ে গেলে রেখে দিয়ে অন্যটি নিতেন যেন কলম চাঁছায় সময় ক্ষেপণ না হয়। আর যখনই তিনি লিখতেন অন্তরের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে লিখতেন। কোন কিতাব দেখতেন না, তথ্য-সূত্র তালাশ করতেন না। এতেই বুঝা যায়, তাঁর মেধা ও ধীশক্তি কত প্রখর ছিল।

তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রখরতার প্রমাণ দিতে গিয়ে কায়রোর এক প্রাজ্ঞজন– সাদীদ দিময়াতী র.– যিনি ইবন নাফীছের শাগরিদ ছিলেন, তিনি বলেন– কাযী জামালুদ্দিন বিন ওয়াছেল এবং ইবন নাফীছ একদিন রাতে এশার পরে আলোচনা শুরু করলেন। আমি তাদের খুব কাছেই শায়িত ছিলাম। বিষয় থেকে বিষয়ে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাঁরা 'বিচরণ' করতে লাগলেন। শায়খ আলাউদ্দিন ইবন নাফীছকে দেখতে পেলাম, কোন রকম বাঁধা-বিপত্তি ছাড়াই দ্বিধাহীনভাবে তিনি আলোচনা করে চলছেন। তবে কাযী জামালুদ্দীনের আলোচনা চালাতে যেন কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। যা তাঁর চেহারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছিল, তাঁর আওয়াজ কখনো উঁচু হয়ে উঠছিল, চোখ লাল হয়ে যাচ্ছিল এবং ঘাড়ের রগ ফুলে ফুলে উঠছিল। এমনিভাবে তাঁদের আলোচনা অব্যাহত থাকল ফজর পর্যন্ত। আলোচনা-পর্যালোচনার যখন সমাপ্তি ঘটল, কাযী জামালুদ্দীন বললেন, হে শায়খ আলা উদ্দীন! আমাদের অবস্থাতো এই যে, পাত্রে সামান্য পানি আর ইলমের খাযানায় সামান্য ক'টা দিরহাম। আর আপনি! আপনার কাছে তো উলূমের সাগর এবং এর ভরপুর খাযানা।

ইলমের চর্চা, আলোচনা ও সংরক্ষণে তাঁর আগ্রহ ছিল সীমাহীন। নতুন কিছুর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে তিনি ছিলেন উদ্যমী ও সদা প্রস্তুত।

রক্তের প্রবাহ ও সঞ্চলনের উদ্ভাবক

একবার তিনি গোসলখানা থেকে অর্ধেক গোসল হতে না হতেই বের হয়ে আসেন এবং কাগজ, কলম ও দোয়াত আনতে বলেন। এসব হাজির হতেই 'হৃদস্পন্দন' সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে শুরু করেন। লেখা শেষ হলে আবার তিনি গোসলখানায় ঢুকেন এবং গোসল সম্পন্ন করেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। দিনে হোক বা রাতে মানুষের উপকার সাধনে কখনো তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। দূর-দূরান্ত থেকে বহু ইলম পিপাসু 'পানি' সংগ্রহের আগ্রহে তাঁর কাছে আসতো, এমনকি শাসক গোষ্ঠীর একটি দলও তাঁর মজলিসে হাজির হতো।

তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তাঁর কয়েকজন চিকিৎসক বন্ধুর ধারণা হল, তিনি অষুধ হিসাবে সামান্য মদ পান করেছিলেন। কারণ তাঁর এমন রোগ হয়েছিল, যার চিকিৎসা শুধু এর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু তিনি (ইবন নাফীছ) এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমার পেটে মদের একটি ফোঁটা পড়বে, আর আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব, এ হতে পারে না।'

তিনি বিবাহ করেননি। মৃত্যুর আগে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সবকিছু, যথা– আলিশান বাড়ি, বিশাল গ্রন্থশালা এবং সকল সম্পদ হাসপাতালের নামে ওয়াক্‌ফ করে যান।

তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ। বিজ্ঞজনদের অনেকেই তাঁকে 'দ্বিতীয় ইবন সীনা' বলে ডাকতেন।

মানবদেহে রক্তের প্রবাহ ও সঞ্চালন সর্বপ্রথম তিনিই উদ্ভাবন করেন। তা-ও আজ থেকে সাত শতাব্দী আগে। আর নির্দ্বিধায়ই বলা যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা এক মহাআবিষ্কার।

আবদুল ফাত্তাহ রহ. বলেন, ইবন নাফীছ র. এই অনন্য বৈশিষ্ট্য ও উজ্জ্বল প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ছিলেন অতি বিনয়ী। তিনি তাঁর শিষ্য ও শাগরিদদের অনুমোদন ও সনদ পত্রে নিজের স্বাক্ষরস্থানে লিখতেন المتطبّب (চিকিৎসা-শিক্ষানবিশ)। অথচ তিনি তখন এ শাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ।

যিকিরের মাধ্যমে অলৌকিক শক্তি লাভ

এর চেয়েও আশ্চর্য হল শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবদুল হালীম দামেস্কী র. (৬৬১-৭২৮ হিজরী) এর অবস্থা। যাঁর জীবনকাল ছিল মাত্র সাতান্ন বছর। তবে কিতাব রচনা করেছেন পাঁচশ' জিলদ এরও অধিক। এক মুহূর্ত সময়ও তাঁর তা'লীম, তাছনীফ কিংবা ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া কাটতো না। যার ফল হয়েছিল, শত শত খণ্ডের কিতাব, যা তাঁর কোন ছাত্র বা অনুসারীদের পক্ষে একত্র করাও সম্ভব হয়নি।

ইবন শাকের তার فوات الوفيات গ্রন্থে লিখেন, ইবন তাইমিয়্যার গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় তিনশ'। তবে হাফেয যাহাবী র. লিখেন এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় পাঁচশ'।

তাঁর (ইবন তাইমিয়্যার) শাগরিদ ইবনুল কাইয়্যিম র. তাঁর কিতাবগুলোর নামের একটি সূচী তৈরী করেছেন। যাতে তিনি প্রায় সাড়ে তিনশ' কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম র. الوابل الصّيب من الكلم الطّيب গ্রন্থে যিকিরের বহু ফায়দা ও উপকারিতা উল্লেখ করেন। এর মধ্যে একষট্টিতম ফায়দা হল, তা 'যাকের' তথা যিকিরকারীকে অলৌকিক এক শক্তি ও ক্ষমতা দান করে। ফলে যিকিরে সময় ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও তার দ্বারা এমন এমন কাজ হয় যা অন্য কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

এরপর তিনি লিখেন– শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার মধ্যে আমি সেই শক্তি ও ক্ষমতার আশ্চর্যরকম প্রকাশ দেখেছি। আমি তা দেখেছি তাঁর রীতি ও অভ্যাসে, আচরণে ও উচ্চারণে এবং সাহসিকতা ও পদক্ষেপ গ্রহণে। আর দেখেছি তাঁর লিখনীতে। তিনি একদিনে যে পরিমাণ লিখতেন তা অনুলিপিকারীর লিখতে লাগত এক সপ্তাহ কিংবা তারচে' বেশী সময়।

প্রিয় পাঠক! এ হল মাত্র একজন আলেমের পরিশ্রমের ফসল এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের পরিণতি। কেউ কেউ তো একথাও বলেছেন যে, কোন মানুষের পক্ষে তাঁর সকল গ্রন্থ পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়। আর আমার মতে এটা মোটেও অত্যুক্তি নয়।

চিকিৎসকের সাথে বিতর্ক

তিনি যে রচনা ও গ্রন্থের বিশাল ভাণ্ডার গড়েছেন এবং তাতে এত সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম হয়েছেন, তা কীভাবে সম্ভব হল? এর ব্যাপারে যদি জানতে চাওয়া হয়, উত্তর শুধু একটাই হবে, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং জীবনকালের মূল্যায়নের মাধ্যমে। সব সময় তিনি তা'লীম তা'আল্লুম ও মুতালা'আ-মুযাকারায় কাটাতেন, কিছুক্ষণের জন্যও এথেকে তিনি ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হতেন না- চাই তা আবাসে হোক বা প্রবাসে, সুস্থতায় হোক বা অসুস্থতায়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম র. বলেন, শায়খ ইবন তাইমিয়্যা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, "একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। চিকিৎসক আমাকে বললেন, আপনার এত অধিক অধ্যয়ন ও ইলমী আলোচনা আপনার ক্ষতির কারণ হবে, রোগ আরও বাড়িয়ে দেবে। কিছু দিনের জন্য এথেকে বিরত ও বিশ্রামে থাকুন। আমি বললাম, আমি এটা মানতে পারব না। তবে আমি আপনার কাছে আপনার জ্ঞান অনুযায়ী ন্যায় বিচার দাবী করছি। বলুন তো, মানুষ যখন আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়, মন ও মেজায কি তখন ভালো হয়ে ওঠে না? আর তা কি অসুস্থতা দূর করে দেয় না? সুস্থতা আনয়ন করে না? তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন বললাম, আমি আনন্দিত হই কিতাবের মুতালা'আ দ্বারা, মন মেজায ভাল হয় ইলমের চর্চা ও আলোচনা দ্বারা, আমি তাতে প্রশান্তি ও স্বস্তি বোধ করি। তারপরও কি বলবেন.........? (নিরুপায় হয়ে) চিকিৎসক বললেন, এটা আমাদের চিকিৎসা বিদ্যার বাইরের বিষয়।

খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকা

الدُّرر الكامنة গ্রন্থে হাফেয ইবন হাজার র. ইমাম শামসুদ্দীন আবুছছানা ইস্পাহানী র. (৬৭৪-৭৪৯ হিজরী) এর জীবনী আলোচনা করে লিখেন- "তিনি মাতৃভূমি ইস্পাহানেই ছাত্র জীবন অতিবাহিত করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনেক দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। ৭২৫ হিজরীর সফর মাসে বায়তুল মাকদিছ যিয়ারতের পর তিনি দামেস্কে আসেন। সেখানকার লোকজন তাঁর গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হন।

শায়খ তাকী উদ্দিন ইবন তাইমিয়্যার কাছে যখন তাঁর কথা পৌছল। তিনি তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন এবং সাক্ষাতে তাঁকে অনেক সম্মান করলেন।

একবার তো তিনি একথাও বললেন, "তোমরা একটু চুপ কর, একটু নীরব হও, আমাদেরকে এ জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তির কথা শুনতে দাও, যার মত জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কেউ ইতোপূর্বে এদেশে আসেনি।"

শেষ জীবনে তিনি কায়রোতে গমন করেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইলম অর্জনে তাঁর আগ্রহ ও আসক্তি এবং সময় সংরক্ষণে তাঁর সতর্কতা ও 'কৃপণতা' সম্পর্কে তাঁর কতক শাগরেদ বলেন, তিনি যথাসাধ্য খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। কারণ খাবার গ্রহণ করলেই পানি পানের প্রয়োজন দেখা দিবে, ফলে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কিছু সময়ের জন্য হলেও ইলম চর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে। তখন তো সে সময়টুকু নষ্ট হয়ে যাবে।

চিন্তা করে দেখুন তো, সময়ের কীরূপ মূল্য ও মূল্যায়ন ছিল এ মহান ইমামের কাছে! ইলমের মর্যাদা, গুরুত্ব ও মূল্যায়নের অনুভূতি তাঁদের মাঝে ছিল বলেই তাদের কাছে সময়ের এ মূল্যায়ন ছিল।

আহ! আল্লাহ তাঁদেরকে কতইনা চমৎকার দৃষ্টি ও কতইনা উত্তম বুঝ দান করেছিলেন।

প্রতিদিন ১৩টি দরস, আর জীবনে ১১৪ গ্রন্থ

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী র. (১১৭৩-১২৫০) البدر الطالع নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে বুদ্ধি-বয়স থেকে তাঁর বেড়ে ওঠা ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেন। সেখানে তিনি সবিনয়ে উল্লেখ করেছেন, দিন-রাতে তাঁর দরসের সংখ্যা ছিল তেরটি। এর মধ্যে কতক তিনি উস্তাযদের থেকে গ্রহণ করতেন আর কতক শাগরিদদের প্রদান করতেন। এভাবেই চলতে থাকে দীর্ঘ দিন। এরপর একটা সময় আসে যখন তিনি শুধু দরস প্রদানে একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করেন। উস্তাযদের থেকে নিয়মতান্ত্রিক দরস গ্রহণ স্থগিত করে দেন। তখনও ছাত্ররা তাঁর থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে দশটিরও উপর দরস লাভ করত। কখনো কখনো এমনও হয়ে যেত এক দিনেই তাফসীর, হাদীছ, উসূল, নাহব, ছরফ, বালাগাত, আরুয, মানতেক ও ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে দরস প্রদান করতে হত।

শাগরিদদের দরস প্রদান ও উস্তাযদের থেকে দরস গ্রহণের সময়কালেও তিনি 'সান'আ' ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তা-ও প্রায় বিশ বছর যাবৎ। এরপর তিনি

সান'আর বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১২২৯ হিজরীতে এবং মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় একুশ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। সর্বমোট তিনি প্রায় ১১৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। যার অধিকাংশের কথাই তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন।

শুধু শেষ রাতের রচনা......

তাফসীর শাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ আবুছ্ ছানা শিহাবুদ্দীন মাহমুদ বিন আবদুল্লাহ আল-আলুসী র. (১২১৭-১২৭০ হিজরী) যাকে বাগদাদের প্রধান মুফতী ও শীর্ষ মুফাসসির গণ্য করা হতো। ইলমের প্রতি তাঁর এমন আসক্তি ছিল যে, তাঁর সার্বক্ষণিক কামনা ছিল, প্রতিটি মুহূর্তে যেন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়। একটু সময়ও যেন উপকারী কোন কিছুর অর্জন, বিরল কোন কিছুর আবিষ্কার কিংবা ব্যতিক্রমী কোন কিছুর উদ্ভাবন ব্যতীত ব্যয় না হয়।

তাঁর দিন অতিবাহিত হত ফাতওয়া ও দরস প্রদানে। আর রাতের প্রথমাংশ অতিবাহিত হত বন্ধুজন বা শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ এবং ইলমী আলোচনায়, আর শেষাংশ তাফসীর সংকলনে। তিনি প্রতি রাতের শেষভাগে, এই অল্প সময়ে যা লিখতেন পরদিন সকালে তাঁর নিয়োগকৃত কাতেবদেরকে (অনুলিপিকারক) তা দিয়ে দিতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই অনুলিখনে তাদের সময় লাগতো দশ ঘণ্টারও বেশী।

এই তাফসীর সংকলনের ব্যস্ততা এবং ফতোয়া প্রদানের গুরু দায়িত্ব সত্ত্বেও বিভিন্ন কিতাব থেকে প্রতিদিন তিনি তেরটি পর্যন্ত দরস প্রদান করতেন।

সময়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি জীবনের শেষ সময়ে, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও রচনা ও সংকলনের কাজ চালিয়ে গেছেন। মুফাসসিরদের কাছে তাঁর লিখিত তাফসীর আজও অনন্য ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর সংকলনরূপে পরিগণিত। অথচ তিনি তা লিখেছেন শুধু রাতের শেষ ভাগে। কবি বলেন–

وبادر الليل بما تشتهى ✪ فانما الليل نهار الأريب

অর্থ : যা কিছু তুমি করতে চাও, রাতের সময়টাকেই কাজে লাগাও
কেননা রাতই হল বিচক্ষণ কর্মবীরের দিবস।

وليلُكَ شطرُعمرك فاغتنمه ✪ ولا تذهبْ بنصف العمر نوماً

অর্থ : রাত তো জীবনের অর্ধাংশ, তাই তাকে কাজে লাগাও। (লক্ষ্য রেখো) তোমার অর্ধ জীবন যেন ঘুমে না কেটে যায়।

আরবী সাহিত্যিক আবু হেলাল আসকারী বলেন–

وساهر الليل فى الحاجات نائمه ✪ وواهب المال عند المجد كاسبه

অর্থ : প্রয়োজন পূরণে রাত্রি জাগরণ সে তো ঘুমেরই মত
আর মহানুভবতা প্রকাশে অর্থ ব্যয় সে তো উপার্জনতুল্য।

আরব কবি ফাক্আসী হামাসী বলেন–

كأنك لم تُسبقْ من الدهر ليلةً ✪ إذا أنت أدركتَ الذى كنتَ تطلب

অর্থ : মহাকালের কোনও রাতেই তুমি পিছিয়ে পড়নি,
যদি তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পার।

ইমাম উমর ইবন ওয়ারদী হালাবী বলেন–

إنَّما يعرفُ قدر العلم مَنْ ✪ سهرتْ عيناه فى تحصيله

অর্থ : ইলমের মূল্য তো সেই বোঝে, যার চোখ তার অর্জনে রাত জাগে।

ইবন নুবাতা সা'দী বলেন–

أ عاذلَتِى على إتعاب نفسى ✪ ورَعْيِى فى الدُّجى روضَ السُّهاد

إذا شام الفتى برق المعالى ✪ فأهونُ فائت طِيْبُ الرُقادِ

অর্থ : হে আমার ভর্ৎসনাকারিণী, নিজেকে আমি কেন ক্লান্ত-শ্রান্ত করে ফেলি এবং অন্ধকারে কেন আমি বিনিদ্রার উদ্যানে বিচরণ করি! আসলে প্রত্যয়ী তরুণ যখন উচ্চশিখরের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হয় তখন সুখনিদ্রা বিসর্জন তার কাছে অতি তুচ্ছ হয়ে যায়।

অন্য এক কবি বলেন,

يهوَى الدَّياجى إذا المغرور أغفلها ✪ كأنَّ شُهب الدَّياجى أعْيِن نُجْل

অর্থ : আঁধারের প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে, প্রবঞ্চিত ব্যক্তি যখন তাতে উদাসীন থাকে। যেন আঁধারের ছাইবর্ণ রমণীর ডাগরচক্ষু।

৩৯ বছর জীবনকালে শতাধিক গ্রন্থ

দূরের কথা তো অনেক হল, এবার কাছের কথা শুনি, এইতো মাত্র একশ' বছর আগের কথা। হিন্দুস্তানের ইমাম আবদুল হাই লাখনাবী র., যিনি ১৩০৪ হিজরীতে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। অথচ তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা শতাধিক। তার মধ্যে অনেকগুলো আছে বড় বড় কয়েক খণ্ডের। আর এসব গ্রন্থের প্রতিটিই মূল্যবান এবং দুরুহ বিষয়ের আলোচনা সম্বলিত।

সহস্রাধিক গ্রন্থের প্রণেতা

এরপর আসা যাক হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. এর কথায়, তিনি গত হলেন তো মাত্র কয়েক দশক হল। ১৩৬২ হিরজীতে ৮১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ সংখ্যা তো হাজারেরও অধিক। আর তা সম্ভব হয়েছে সময়ের সঠিক মূল্যায়ন ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে সফল মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আর তাদের সংখ্যা আরও কম যাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত অথচ কর্ম পরিধি সুবিস্তৃত। জীবন মাত্র কয়েক দশক, কিন্তু কর্মপরিধি বিশাল ব্যাপ্ত সমুদ্র। আমরা তো শুধু এতটুকুই বলতে পারি- ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।)

কুরআনের কতক খেদমত

এ প্রসঙ্গে আমাদের শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ যাহেদ আল কাওছারী র. এর একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। এ গ্রন্থে তিনি শুধু বৃহৎ কলেবরের তাফসীর গ্রন্থগুলোর কথা আলোচনা করেছেন। যে গ্রন্থগুলোর বিশালতাই ইলমের প্রতি রচয়িতাদের সীমাহীন আগ্রহ ও সময় সংরক্ষণে তাদের প্রাণান্তকর চেষ্টার কথা প্রমাণ করে। অন্যথায় কীভাবে অস্তিত্ব লাভ করতো এই বিশাল বিশাল গ্রন্থ, যেগুলোর কথা শুনেই আজ মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তার অধ্যয়ন বা সংকলন তো বহু দূরের কথা।

কোরআনের যে সকল দিকে এযাবৎ বিশাল বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেয়া হয়েছে তার কতক নিয়ে আলোচনা করতঃ শায়খ কাওছারী তার

“মাকালাতে কাওছারী” গ্রন্থে লিখেন, কুরআনুল কারীমের এ যাবৎ কত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যে লেখা হয়েছে– মত ও পথের ভিন্নতা, রুচি ও আগ্রহের পার্থক্য এবং ভাষা ও পরিবেশের তারতম্যের কারণে– কেউ বা রিওয়ায়েত ও দিরায়াতের মাধ্যমে, কেউ বা উলূমুল কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে, আবার কেউ কোরআনের বৈশিষ্ট্যাবলীর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে– তা গুণে শেষ করা অসম্ভব বা প্রায় অসম্ভব।

আশা করি, পাঠক আমাকে সুযোগ দিবেন, ঐ বিষয়ে পূর্বসূরী মনীষীগণের কিছু গ্রন্থের কথা উল্লেখ করার। যেগুলোর সংকলন তাঁদের সীমাহীন ত্যাগ-সাধনার প্রমাণ বহন করে।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী র. المُختزن নামে একটি তাফসীর লিখেন যা ছিল প্রায় সত্তর খণ্ডের।

কাযী আবদুল জাব্বার আল-হামাদানী র.-এর তাফসীরের নাম হল المُحيط যা ছিল বেশ বড় বড় একশ’ খণ্ডের।

আবু ইউসুফ আবদুস সালাম আল কাযবীনী র. এর তাফসীর সম্পর্কে যতগুলো বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে সবচে’ কম বলা হয়েছে যে বর্ণনায়– তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা ছিল সর্বমোট তিনশ’ খণ্ডের। সংকলক তা বাগদাদের “মসজিদে-আবু হানীফা র.”-এর জন্য ওয়াকফ্ করে দেন। তবে আফসোসের বিষয়, পরবর্তীতে তা ঐ সকল কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো বাগদাদে তাতারীদের আক্রমণকালে ধ্বংস হয়ে যায়।

শায়খ কাওছারী বলেন– তবে আমি হিন্দুস্থানের এক সাহিত্যিককে বলতে শুনেছি যে, তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণাগারের এক সূচিতে তার একটি অংশের কথা উল্লিখিত দেখেছেন।

তারপর উল্লেখ করা যায়, হাফেয ইবন শাহীনের তাফসীরের কথা, যা ছিল এক হাজার জুয বা ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠার।

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর তাফসীরের নাম أنوار الفجر। তাও প্রায় আট হাজার পৃষ্ঠার। জানা যায় যে, তা আমাদের দেশে অর্থাৎ ইস্তাম্বুল ও তুর্কিস্থানের গ্রন্থাগারগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। তবে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও আমি তা পাইনি।

ইবন নাকীব আল-মাকদিসী র. এরও একটি তাফসীর রয়েছে যা প্রায় শত খণ্ডের কাছাকাছি কলেবরের। অবশ্য এর কতক খণ্ড এখন ইস্তাম্বুলের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণাগারে পাওয়া যায়।

আমাদের জানামতে বর্তমানে পাওয়া যায় এমন সর্ববৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ তাফসীর হল فتح المنّان যা التفسير العلامى নামে পরিচিত। এর নাম রাখা হয়, আল্লামা কুতুবুদ্দীন সিরাজী র.-র নিসবতে। এ তাফসীরটি প্রায় চল্লিশ খণ্ডের। এর প্রথম খণ্ডটি মিসরের দারুল কুতুবে পাওয়া যায়। এর মাধ্যমেই পুরো তাফসীরটির পদ্ধতি ও প্রণালী স্পষ্ট বুঝা যায়। এছাড়াও ইস্তাম্বুলের মাকতাবায়ে মুহাম্মাদ আসআদ ও মাকতাবায়ে আলী পাশায় এর বাকী খণ্ডগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

المنهلُ الصّافى গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মুহাম্মাদ যাহেদ বুখারী র. এরও একটি তাফসীর রয়েছে, যা প্রায় শত খণ্ডের।

এক কথায় বলতে গেলে, এক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের এছাড়াও বহু এবং বিশাল বিশাল খেদমত রয়েছে, যার গণনা প্রায় অসম্ভব। আর অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তো অজস্র-অগণিত কিতাবের ভাণ্ডার রয়েছেই।

অধিক গ্রন্থ রচনাকারীদের কতক কীর্তি

আল্লামা মুহাম্মাদ আল হাসান আল হাজভী র. এক আশ্চর্যজনক কিতাব রচনা করেন যার নাম– الفكرُ السّامى فى تاريخ الفقه الإسلامى তাতে তিনি অধিক গ্রন্থ রচনাকারীদের কীর্তিসহ একটি তালিকা উল্লেখ করেন, সেখানে ইবন জারীর তাবারী, ইবনুল জাওযীসহ আরো অনেকের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আমি সেখান থেকে কিছু কথা উল্লেখে প্রয়াসী হচ্ছি। যদিও এতে পূর্বালোচনার কিছুটা পুনরুক্তি হবে তবুও মনে হয় তা একেবারে বেফায়দা হবে না।

তিনি (মুহাম্মাদ আল হাসান) লিখেন, রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে বলা যায়, ইমাম ইবন জারীর তাবারী র. বিজয়মাল্য অর্জন করেছেন। কেননা তার লেখার উপকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। আর সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, তিনি যে রচনা সম্ভার রেখে গেছেন তা হিসাব করে দেখা যায়, তা প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পৃষ্ঠা। এরচে' সমৃদ্ধ ইলমী মিরাছ আকাবিরদের কারও থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেনি। এতটা নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যাপক উপকারিতা সহ এত অধিক খেদমত আর কেউ আঞ্জাম দিতে পেরেছন বলে আমার মনে হয় না। তাই তো তাঁর

ক্ষেত্রে বলা হয় إنه أعظمُ مؤلِّف فى الإسلام (তিনি হলেন ইসলামের সবচে' বড় লেখক।)

এছাড়া বৃহৎ কলেবরের সংকলকদের অন্যতম হলেন কাযী আবু বকর মুহাম্মাদ বিন তায়্যিব র.। যিনি "বাকিল্লানী" নামে পরিচিত। প্রতিরাতে তিনি বিশ 'তারবিহা' অর্থাৎ আশি রাকাত নামায আদায় না করে এবং সর্বনিম্ন পঁয়ত্রিশ পাতা না লিখে ঘুমাতেন না। এটাই ছিল তার প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাস।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

এরপর বলা যায়, ইবন আবুদ্ দুনিয়া র. এর কথা। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন, আর ইবন আসাকির র. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থটি লিখেছেন প্রায় আশি খণ্ডে।

ইমাম সুয়ূতী র. বলেন, সর্বাধিক তাছনীফের অধিকারী হলেন, ইবন শাহীন র.। তিনি প্রায় তিনশ ত্রিশটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন, এর মধ্যে রয়েছে তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ যা প্রায় এক হাজার জুয বা ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠার। এবং রয়েছে المسند যা পনেরশ' জুয বা পঁয়তাল্লিশ হাজার পৃষ্ঠার।

ইমাম সুয়ূতী র. আরও বলেন, এসব কিছুই সম্ভব হয় আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে। তিনি কারো জন্য কোন ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে দেন, আবার কারও জন্য সময়কে বিস্তৃত করে দেন। আর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এসবই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ ও লাইলাতুল কদরের বরকত।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবন হাযম র. এর রচনা সম্ভারে রয়েছে প্রায় চারশ খণ্ড সমৃদ্ধ গ্রন্থ। যাতে রয়েছে প্রায় আশি হাজার পৃষ্ঠা।

আর ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবু হাতিম আর-রাযী র. হাদীছ, ফিক্হ, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রে অনেক কিতাব লিখেছেন। তার মধ্যে একটি হল المسند যার পরিধি এক হাজার জুয।

আবু আবদুল্লাহ র. যিনি 'ইবনুল বায়্যি' ও 'হাকীম নিশাপুরী' নামে পরিচিত। তিনি বুখারী ও মুসলিম শরীফের পর্যালোচনায় একটি গ্রন্থ লিখেছেন। যার নাম المستدرك على الصحيحين যা প্রায় দেড় হাজার জুয

সম্বলিত। তার মধ্যে রয়েছে العلل، تخريج الصحيحين، الأمالى، فوائد الشيوخ، تاريخ نيسابور ইত্যাদি বিষয়বস্তু।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

ইমাম আবুল হাসান আশআরী র. এর গ্রন্থ সংখ্যা ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি। যার অধিকাংশই হল বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে। আর এটাতো সবারই জানা কথা যে, সংকলনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। কলম ধরতে হয় অতি সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে, ধীর গতিতে। তাই এতে সময়ও ব্যয় হয় অনেক বেশী।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যা র. সংকলিত গ্রন্থের সংখ্যা বিভিন্ন বিষয়ে ও শাস্ত্রে প্রায় তিনশ'। খণ্ড হিসাবে যেগুলোতে রয়েছে প্রায় পাঁচশ' খণ্ড। আর তাঁর শাগরিদ ইবনুল কায়্যিম র. রচনা করেন বড়-ছোট মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ খণ্ড কিতাব।

আর ইমাম বায়হাকীর রচনায় রয়েছে প্রায় হাজার জুয এবং এর প্রতিটিই অনন্য সাধারণ। যার দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর কৃতিত্ব আলোচনায় আরো বলতে হয় যে, তিনি একাধারে ত্রিশ বছর রোযা রেখেছেন।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

তারপর বলা যায়, মুহাম্মাদ ইবন ছাহনূন আফ্রিকী র. এর কথা। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন আইন, ইতিহাস, জীবনচরিত ও অন্যান্য বিষয় সম্বলিত বিশাল গ্রন্থ الكبير যা শত খণ্ডের। এছাড়াও রেখে গেছেন মূল্যবান কিতাব أحكام القرآن সহ অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবীর রচিত বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থটি প্রায় আশি খণ্ডের। এছাড়াও ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যেমন তিরমিযী ও মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং المحصول فى الأصول، العواصم من القواصم، أحكام القرآن ইত্যাদি। আর প্রত্যেকটি গ্রন্থ যথেষ্ট মানসম্পন্ন ও উচ্চস্তরের। কিন্তু বর্তমানে এর সবগুলোই প্রায় বিরল ও দুষ্প্রাপ্য।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী র. ও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ তো এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্ব কি ইফরাদ, কিরান, না তামাত্তু ছিল– এই একটি মাত্র মাসআলা সম্পর্কে

তিনি হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন। এ জাতীয় উদাহরণ উলামায়ে ইসলামের মাঝে কটাই বা পাওয়া যায়!

نفح الطيب গ্রন্থে আছে আবু উবাইদা মা'মার বিন মুছান্না র. এর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় দু'শ, আর ইবন সুরায়জ র. এর গ্রন্থ সংখ্যা হল প্রায় চারশ'। কাযী ফাযেল র. এর প্রায় একশ, আর আবদুল মালিক বিন হাবীব যিনি عالم الأندلس খেতাবে ভূষিত, তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

আর তাঁদের এ সমস্ত রচনা ও সংকলন কোন এক বিষয়ে নয়; বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন শাস্ত্রে।

পূর্ববর্তী মনীষীগণের অধিকাংশ কিতাবই বিশাল আকৃতির ও বহু খণ্ডের। যেমন ইতিহাসের গ্রন্থ مرآة الزمان যা সিবত ইবন জাওযীর লেখা, তা প্রায় চল্লিশ খণ্ডের। খতীব বাগদাদী র. এর রচিত تاريخ بغداد প্রায় চৌদ্দ খণ্ডে এবং الأغاني বিশ খণ্ডে। ইবন আছীর র. এর كامل বার খণ্ডে। আর আবু হানীফা দিনাওয়ারী র. এর شرح النبات গ্রন্থটি ষাট খণ্ডের।

এরপর উল্লেখ করা যায়, আরব দার্শনিক ইয়াকুব বিন ইসহাক কিনদী র. এর কথা। যার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সংখ্যা দুইশতাধিক। বরং সর্বসাকুল্যে বলা যায় তিনশতাধিক। আর এগুলো অধিকাংশই দর্শন, চিকিৎসা, প্রকৌশল ইত্যাদি জটিল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। তবে এসব গ্রন্থের কোন কোনটির কলেবর দশ থেকে একশত পাতা পর্যন্ত।

আর বলে রাখা ভাল, বিভিন্ন বিষয়ের এত বিশাল বিশাল গ্রন্থ সব লেখা হয়েছে এমন যুগে, যখন প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপায় উপকরণ পাওয়া ছিল খুব দুষ্কর।[৩৩]

তবে পরবর্তী যুগের তথা নিকট অতীতের মনীষীগণের সামনে বিষয়বস্তু ছিল অনেক। তা সত্ত্বেও তাদের রচনার পরিমাণ পূর্ববর্তীগণের রচনার সমান

---

৩৩ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে যে কাজের জন্য মনোনীত করেন এবং যতটুকু করার তাওফীক দেন তার দ্বারাই সে কাজ করা সম্ভব হয় এবং ততটুকুই সম্ভব হয়।

নয়। তাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় فتح البارى ও الإصابة ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা ইবন হাজার র. ও হাফেয যাহাবীর কথা। আরও বলা যায়, ইমাম সুয়ূতী র. এর কথা, যার রচনা ও সংকলন প্রায় চারশরও অধিক। যদিও এর অধিকাংশই ছোট আকৃতির ও ক্ষুদ্র কলেবর সম্পন্ন। কোনটি তো এক দুই পাতার মাত্র। তাঁর থেকেও অধিক রচনার অধিকারী শায়খ আবুল ফয়য মুহিব্বুদ্দিন মুহাম্মাদ মুরতাযা আল-হুসাইনী র.। যাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা ভারতবর্ষে। তবে আদি নিবাস মিশরে। তাঁর রচনার আধিক্য প্রমাণে شرح القاموس ও شرح الإحياء ই যথেষ্ট। কিতাব দু'টি যেমন উপকারী তেমনি নির্ভরযোগ্য। তাই সে দু'টি গোটা ইসলামী বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। (انتهى)

কেন এই দীর্ঘ আলোচনার উল্লেখ?

প্রশ্ন হতে পারে, মুহাম্মাদ আল হাছান আল হাজ্ভী র. এর এই দীর্ঘ আলোচনা আমি কেন আনলাম? মূলত বিশাল বিশাল গ্রন্থের বিস্ময়কর আধিক্য এবং প্লাবন সদৃশ এর ধারাবাহিক আলোচনা আমাকে তা উল্লেখে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিস্ময়াবিভূত হয়ে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতে থাকি, কীভাবে এগুলো লেখা হল! কীভাবে এগুলো একত্র করা হল! কী পরিমাণ মেহনত, মোজাহাদায় এ জ্ঞান সঞ্চিত হল!

নিঃসন্দেহে এ সবকিছুই সময়ের সদ্ব্যবহার, সঠিক ও যথাযথ মূল্যায়নের ফল। মুহূর্ত পরিমাণ সময়ও নষ্ট না করার পরিণতি এমনই হয়।

(প্রিয় পাঠক! যখন মানুষ সময়ের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে তখন সংকীর্ণ জীবনও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়, সীমিত সময়ও বিস্তৃত হয়ে যায়। আর বান্দার পক্ষ থেকে যখন চেষ্টার চূড়ান্ত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন রহমত নেমে আসে-অঝোর ধারায়, ফলে কর্ম ও কীর্তির পাহাড় গড়ে ওঠে। –অনুবাদক)

ইবন আসাকির দিমাশকির সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র

যে সকল ওলামায়ে কেরাম সময়ের হেফাযত করেছেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেছেন, এবং ইলমের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন, বিরল ও সূক্ষ্ম বহু জ্ঞান আমাদের জন্য সঞ্চিত রেখে গেছেন তাদের

আলোচনা শেষ করার আগে আমি হাফেয আবুল কাসেম ইবন আসাকির দিমাস্কী র.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করতে চাচ্ছি। কারণ তাঁর জীবনীতে এমন কতক দিক ও এমন সব কর্ম ও কীর্তি রয়েছে যা পাঠককে সময়ের হেফাযতে আরও আগ্রহী এবং তার মনোবল ও প্রত্যয়কে আরো দৃঢ় করে তুলবে। আমি তো এতটুকু বলতে চাই যে, তা উদাসীনকেও উদ্দীপ্ত করবে, ঘুমন্তকেও জাগ্রত করবে ইনশাআল্লাহ।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

"হাফেয আবুল কাসেম ইবন আসাকির দিমাশকী, (৪৯৯-৫৭১ হিজরী) যাঁর প্রকৃত নাম হল, আলী ইবনুল হাছান। কিন্তু তিনি উপনামেই[৩৪] অধিক খ্যাত। তিনি সর্বদা সময়ের হেফাযত করতেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি ক্ষণের সদ্ব্যবহার করতেন। ফলে ইসলামী পাঠাগারগুলো তাঁর রচনা ও সংকলন দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এত অধিক পরিমাণে তাঁর সঞ্চিত জ্ঞান নির্যাসে সিক্ত হয়েছে যা ছাপানো আজকের কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্যও দুষ্কর। অথচ তিনি একাকী সেগুলো লিখেছেন। নিজ হাতে ও আপন কলমে সেগুলো সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।

এসব কিছুই প্রমাণ করে যে, ধী-শক্তির প্রখরতা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মনোবলের উচ্চতা এবং সংকলনের আধিক্যে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। এখানে আমি তিনটি কিতাব থেকে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর জীবনীর দু'একটি দিক আলোচনা করব– যা তাঁর সময়ের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার এবং সফরের আধিক্য সত্ত্বেও রচনা ও সংকলন আধিক্যের প্রমাণ বহন করে।

'ওফায়াতুল আ'য়ান' থেকে

১. ঐতিহাসিক কাযী ইবন খাল্লিকান র. وفيات الأعيان গ্রন্থে ইবন আসাকির র. এর জীবনী আলোচনা করতঃ উল্লেখ করেন– "তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ হাদীছ শাস্ত্রবিদ এবং নেতৃস্থানীয় শাফেয়ী ফকীহ। তাঁর যুগে তাকে محدث الشام (অর্থাৎ, শামের শ্রেষ্ঠ হাদীছবিদ) বলা হত। হাদীছ ও ফিক্হ উভয় শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ও পারদর্শিতা থাকলেও হাদীছেই তিনি মেহনত মোজাহাদা বেশী করেছেন এবং এর মাধ্যমেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি

[৩৪] তথা ইবন আসাকীর।

হাদীছের অন্বেষণে ও সংরক্ষণে অসাধারণ মেহনত-মোজাহাদা করেছেন। ফলে এই পরিমাণ হাদীছ তিনি জমা করেছেন, যার তাওফীক তাঁর যুগে আর কেউ পায়নি। এজন্য তিনি বহু এলাকায়, বহু শহরে, এমনকি বহু দেশে সফর করেছেন এবং বহু শায়খের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

তিনি ছিলেন হাফেয আবু সা'দ আবদুল কারিম ইবন সামআ'নী র. এর রফিকে-সফর বা ভ্রমণসঙ্গী। হাদীছের সন্ধানে দেশের পর দেশ তাঁরা একত্রে সফর করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, দারুল ইসলাম তথা ইসলামী সাম্রাজ্যের পরিধিতে যে সকল শায়খের সাথে সামআ'নী র. সাক্ষাত করেছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

ইবন আছাকির র. ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং অত্যন্ত ধর্মভীরু। একাধিক সনদে লক্ষাধিক হাদীছ তিনি হাসিল করেছেন, যার প্রায় সবই ছিল তাঁর মুখস্থ। হাদীছ সংগ্রহে তিনি বহু দূর-দূরান্তে তথা, বাগদাদ, দামেস্ক, খুরাসান, নিশাপুর, হিরাত, ইস্পাহান, জিবাল ইত্যাদি অঞ্চলে সফর করেছেন।

হাদীছ শাস্ত্রে তিনি একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং এর উপর চমৎকার সব আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি অন্যান্য বিষয়েও একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল التاريخ لدمشق যা তিনি খতীব বাগদাদীর تاريخ بغداد এর রীতিতে লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা পরিণত হয়েছে বিশাল কলেবরের, বহু খণ্ডের এবং বহু উপকারী ও নতুন বিষয়ের সম্মেলন। তা ছিল প্রায় আশি খণ্ডের।

আমার উস্তায হাফেয আল্লামা যাকীয়ুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল আযীম মুনযিরী র. এই ইতিহাস গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা কালে তার একটি খণ্ড বের করে আমাকে দেখান এবং এর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ও প্রশংসা করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, কিতাবটির আকৃতি ও প্রকৃতি দেখলে মনে হয় লেখক যেদিন বুঝতে শিখেছেন সেদিন থেকে তা রচনায় মশগুল হয়েছেন। নতুবা দরস-তাদরীসের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পর এবং প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জনের পর এক জীবনে এত বড় কাজ আঞ্জাম দেয়া তো অসম্ভব প্রায়।

আর আমার মনে হয় তিনি এ মন্তব্যে অসত্য কিছু বলেন নি, এবং কোন অতিশায়নও করেন নি। এই কিতাব কিংবা এর লেখক সম্পর্কে যার সামান্যতমও অবগতি আছে, সে ব্যক্তি নির্দ্বিধায় এ কথার সত্যতা স্বীকার

করে নেবে এবং অনুধাবন করবে, কখন ও কীভাবে সময় মানুষের জন্য বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে যায় এবং জীবনের বহু ব্যস্ততার মাঝেও এমন সুবিশাল গ্রন্থ রচনার সুযোগ করে দেয়। তাও আবার এক ধাপেই নয়; কয়েক দফা বিশাল খসড়া পাণ্ডুলিপিথ যা একত্রকরণ ও বিন্যস্তকরণ প্রায় অসম্ভব পর্যায়ে ছিল– তা তৈরি ও সম্পাদনার পর।

এছাড়াও তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ ও বহুখণ্ডের কিতাব রয়েছে, (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, تاريخ مدينة دمشق এর কথা। যা প্রায় আশি খণ্ডের)। কেউ কেউ তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা "পঞ্চাশ" উল্লেখ করেছেন।

তাযকিরাতুল হুফফায' থেকে

২. দ্বিতীয় কিতাবটি হল, হাফেয যাহাবী র. এর تذكرة الحفاظ তাতে ইবন আসাকির র. এর জীবনী আলোচনা করতঃ উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রখ্যাত হাফেয, শামের মুহাদ্দিছ, ইমামকুলের গৌরব, التاريخ الكبير সহ আরও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আবুল কাসেম ইবন আসাকির র., যিনি ৪৯৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫০৫ হিজরীতে মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতা ও ভাই যিয়াউদ্দীন হিবাতুল্লার তত্ত্বাবধানে হাদীছ শ্রবণ ও সংগ্রহ শুরু করেন। বিশ বছর বয়সে হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করেন এবং বহু দেশের বহু শায়খ থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন। তাঁর উস্তায সংখ্যা অর্থাৎ যাদের থেকে তিনি হাদীছ অর্জন করেছেন তাদের মাঝে রয়েছেন তেরশত পুরুষ এবং আশির কিছু বেশী নারী। الأربعين البُلدانية নামে তিনি একটি গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে তিনি এমন চল্লিশটি হাদীছ উল্লেখ করেন, যা তিনি ভিন্ন ভিন্ন শহর ও অঞ্চলের চল্লিশজন শায়খ থেকে অর্জন করেছেন।

তিনি যেমন বহুসংখ্যক শায়খ থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন তেমনি তাঁর থেকেও বহুসংখ্যক ব্যক্তি হাদীছ শ্রবণ ও অর্জন করেছেন। এমনকি তাঁর সফর সঙ্গী আবু সা'দ সামআনীও এদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর হাফেয যাহাবী র. তাঁর (ইবন আসাকিরের) সংকলন সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, তা পঞ্চাশের কম নয়। তা ছাড়াও ইলমের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি প্রায় চারশ' আশিটি মজলিসের শ্রুতলিপি লিখিয়েছেন। আর এর প্রত্যেকটিই একেকটি কিতাবতুল্য।

তাঁর ছাহেবজাদা মুহাদ্দিছ বাহাউদ্দীন কাসেম বলেন, আব্বাজান (রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা) ছিলেন জামাত ও তেলাওয়াতের পূর্ণ পাবন্দ। স্বাভাবিকভাবে তিনি প্রতি শুক্রবারে কোরআন খতম করতেন। আর রমযানে প্রতিদিনই এক খতম হতো। গোটা রমযান দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারে ই'তিকাফ করতেন। শবে বরাত ও দুই ঈদের রাত তিনি দুআ, নামায ও যিকির-আযকারে অতিবাহিত করতেন। আর সবসময়ই প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাপারে নিজেকে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করতেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন না শায়খগণ থেকে তিনি হাদীছ রেওয়ায়াতের অনুমতি পেয়েছেন ততদিন পর্যন্ত হাদীছ সংগ্রহ ও শ্রবণে তাঁর সময় অতিবাহিত করেছেন, অন্য কোন কাজে মশগুল হননি। হোক তা সাধারণ দিন বা উৎসব-আয়োজনের দিন। কিংবা কোলাহলের দিন বা নির্জনতার দিন।

আবুল আলা হামাদানী র. বলেন, আবুল কাসেম ইবন আসাকিরের মেধার তীক্ষ্ণতা ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে তাকে شُعْلَة النار (অগ্নিশিখা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

আবুল মাওয়াহিব বিন সাস্‌রা বলেন, আমি একদিন তাঁকে (ইবন আসাকির র. কে) বললাম, মেধা-যোগ্যতা ও মেহনত-মোজাহাদায় হযরত কি নিজের কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পান? তিনি বললেন, এভাবে বলো না; আল্লাহ তাআলা বলেছেন, لاتزكُّوْا انفسكم (অর্থ : তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না।) আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা তো এও বলেছেন– وأمَّا بنعمة ربِّك فحدِّثْ (অর্থ : তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বর্ণনা কর)। তখন তিনি আত্মগর্ব পরিহার করতে নামপুরুষের ভাষ্যে বললেন, "কেউ যদি একথা বলে যে, আমার এই দু'চোখ তাঁর মত কোন ব্যক্তি দেখেনি তবে–সে সত্যই বলবে।

এরপর আবুল মাওয়াহেব বলেন, অন্তত আমি একথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, তাঁর মত এত গুণের আধার-আমি আর কাউকে দেখিনি। এত বৈশিষ্ট্যের সমাহার আমি আর কারো মাঝে পাইনি। তিনি একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত একই ধারায়, একই পন্থায় জীবন কাটিয়েছেন– প্রথম কাতারে নামায পড়েছেন, প্রতি রমযান ও জিলহজ্বের দশ দিন ই'তিকা'ফ করেছেন, ধন-সম্পদ অর্জন বা গৃহনির্মাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে থেকেছেন, ইমামত ও খিতাবাতের দায়িত্বকে এড়িয়ে চলেছেন। প্রস্তাব করা হলে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর শুধু 'আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল

মুনকার'-এর মাঝেই নিজের কাজ-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, মগ্নতা-ব্যস্ততাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এ পথে ও আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দা ও তিরস্কারের পরোয়া তিনি কখনো করেন নি।

'তাবাকাতুশ্ শাফিইয়্যাহ' 'আল-কুবরা' থেকে

৩. তৃতীয় কিতাবটি হল (ইমাম তাজউদ্দীন সুবকী র. এর লেখা)- طبقات الشافعية الكبرى যা থেকে আমরা ইবন আসাকির র. এর জীবনীর অংশ বিশেষ উল্লেখ করতে চাচ্ছি। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে- "হাদীছ শাস্ত্রের এক মহান ইমাম ও হাফেয হলেন আবুল কাসেম। যিনি ইবন আসাকির নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, যদিও আমরা ইতিহাসে অনুসন্ধান করে তাঁর পূর্বপুরুষগণের কারো নাম "আসাকির" পাইনি।

তিনি ছিলেন সুন্নাহ তথা হাদীছের প্রকৃত একজন সেবক এবং তাঁর যুগে এ শাস্ত্রের ইমাম। তাঁকে শাস্ত্র-পণ্ডিতগণের সারনির্যাসও বলা যায়। দূর-দূরান্ত থেকে তালেবে ইলমরা তাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণে তাঁর কাছে আসতো।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইলম ও আমলকেই তিনি একান্ত সহচর ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এদু'টোই ছিল তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, অপ্রচলিত ও ব্যতিক্রমী কোন কিছুও তাঁর স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেত না। সবকিছু তাঁর স্মৃতিতে এমনভাবে সংরক্ষিত হয়ে যেত যে, সেখানে নতুন-পুরাতন, দুর্লভ ও সুলভ কোন কিছুতেই পার্থক্য থাকতো না।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততায় পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যাননি, কিন্তু তিনি তাঁদের থেকে খুব পিছেয়ে নন। আর ইলমের গভীরতা ও ব্যাপকতায় তিনি ছিলেন এতটাই সমৃদ্ধ যে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তিনি অনিবার্য ও অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। বহু জন থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং সংগ্রহ করেছেন। তাঁর শায়খগণের তালিকায় রয়েছেন প্রায় এক হাজার তিনশ' পুরুষ এবং আশিজনের মত নারী। আর এসকল হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন বহুদেশ, বহু এলাকা। বহু দূর-দূরান্তে ও জনশূন্য মরু প্রান্তরে তিনি বাহন চালিয়েছেন একাকী-নিঃসঙ্গ অবস্থায়। তাঁর সঙ্গী ছিল শুধু তাকওয়া ও খোদাভীতি, যা তিনি একান্ত গভীর ও নিবিড়ভাবে ধারণ করেছিলেন এবং 'যাকে' সার্বক্ষণিক সহচররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

আর তাঁর ছিল দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয় এবং দুর্দমনীয় উদ্যম; শেষ গন্তব্যে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা ছাড়া যা ক্ষান্ত হতো না। তাঁর শায়খ খতীব আবুল ফযল আত-তুসী র. বলেন, বর্তমান যুগে ইবন আসাকির ছাড়া "হাফেয" উপাধি পাওয়ার যোগ্য আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। ইবন নাজ্জার র. বলেন, তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আর হিফয ও ইতকানে, নির্ভরতা ও স্মৃতির প্রখরতায় এবং হাদীছ শাস্ত্রে জ্ঞানের পূর্ণতায় এবং চমৎকার ও অভিনব সব বিষয়ে কলম চালনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর যুগে কিংবা পরবর্তীকালে এ শাস্ত্রে আর কেউ এরূপ জ্ঞান ও এমন অবস্থান অর্জন করতে পারেনি।

ইবন নাজ্জার র. বলেন, আমি আমার শায়খ আবদুল ওয়াহহাব ইবন আমীন র. কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি হাফেয আবুল কাসেম ইবন আসাকির ও আবু সাঈদ বিন সামআনীর সাথে ছিলাম। এসময় আমরা জনৈক শায়খের সাক্ষাতে এবং তার থেকে হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম, যখন শায়খের সাক্ষাত লাভ হল, ইবন সামআনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কিছু পড়তে চাইলেন। তাই তার হাদীছের পাণ্ডুলিপির সূচীপত্রে এই শায়খ থেকে শ্রুত একটি জুয বা খণ্ডের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পরও তিনি তা পেলেন না। ফলে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। তখন ইবন আসাকির (দ্বিধাহীন কণ্ঠে) জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর থেকে শ্রুত কোন খণ্ডটি তুমি খুঁজছ? তিনি বললেন, ইবন আবু দাউদের البعث والنشور খণ্ডটি, যা তিনি আবু নাসের যায়নবী থেকে শুনেছেন। ইবন আসাকির বললেন, ঠিক আছে, ঐ খণ্ডটি আমি তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি। একথা বলে তিনি গোটা কিতাবটিই তাকে মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন।

শায়খ মুহয়ুদ্দীন নববী র. তো ইবন আসাকির র. সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন–

هو حافظ الشام، بل هو حافظ الدنيا، الإمام مطلقا، الثقة والثبت

তিনি হলেন (হাদীছ শাস্ত্রে) শাম দেশের শ্রেষ্ঠ হাফেয, বরং পৃথিবীর অন্যতম হাফেযে হাদীছ ও এবং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিছ।

মুনকার'-এর মাঝেই নিজের কাজ-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, মগ্নতা-ব্যস্ততাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এ পথে ও আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দা ও তিরস্কারের পরোয়া তিনি কখনো করেন নি।

'তাবাকাতুশ্ শাফিইয়্যাহ' 'আল-কুবরা' থেকে

৩. তৃতীয় কিতাবটি হল (ইমাম তাজউদ্দীন সুবকী র. এর লেখা)- طبقات الشافعية الكبرى যা থেকে আমরা ইবন আসাকির র. এর জীবনীর অংশ বিশেষ উল্লেখ করতে চাচ্ছি। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে- "হাদীছ শাস্ত্রের এক মহান ইমাম ও হাফেয হলেন আবুল কাসেম। যিনি ইবন আসাকির নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, যদিও আমরা ইতিহাসে অনুসন্ধান করে তাঁর পূর্বপুরুষগণের কারো নাম "আসাকির" পাইনি।

তিনি ছিলেন সুন্নাহ তথা হাদীছের প্রকৃত একজন সেবক এবং তাঁর যুগে এ শাস্ত্রের ইমাম। তাঁকে শাস্ত্র-পণ্ডিতগণের সারনির্যাসও বলা যায়। দূর-দূরান্ত থেকে তালেবে ইলমরা তাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণে তাঁর কাছে আসতো।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইলম ও আমলকেই তিনি একান্ত সহচর ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এদু'টোই ছিল তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, অপ্রচলিত ও ব্যতিক্রমী কোন কিছুও তাঁর স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেত না। সবকিছু তাঁর স্মৃতিতে এমনভাবে সংরক্ষিত হয়ে যেত যে, সেখানে নতুন-পুরাতন, দুর্লভ ও সুলভ কোন কিছুতেই পার্থক্য থাকতো না।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততায় পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যাননি, কিন্তু তিনি তাঁদের থেকে খুব পিছেয়ে নন। আর ইলমের গভীরতা ও ব্যাপকতায় তিনি ছিলেন এতটাই সমৃদ্ধ যে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তিনি অনিবার্য ও অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। বহু জন থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং সংগ্রহ করেছেন। তাঁর শায়খগণের তালিকায় রয়েছেন প্রায় এক হাজার তিনশ' পুরুষ এবং আশিজনের মত নারী। আর এসকল হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন বহুদেশ, বহু এলাকা। বহু দূর-দূরান্তে ও জনশূন্য মরু প্রান্তরে তিনি বাহন চালিয়েছেন একাকী-নিঃসঙ্গ অবস্থায়। তাঁর সঙ্গী ছিল শুধু তাকওয়া ও খোদাভীতি, যা তিনি একান্ত গভীর ও নিবিড়ভাবে ধারণ করেছিলেন এবং 'যাকে' সার্বক্ষণিক সহচররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

হাদীছের জন্য তাঁর অস্থিরতা

স্মৃতিশক্তির এত প্রখরতা সত্ত্বেও হাদীছের হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা অবিকৃতরূপে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। তাই তাঁর শ্রুত হাদীছগুলোর অনুলিপি তাঁর কাছে পৌঁছতে দেরী হওয়ায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং তা হাতে পাওয়া পর্যন্ত অস্থির-উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর পুত্র হাফেজ আবু মুহাম্মাদ আল-কাসেম বলেন, আমার আব্বা এমন বহু হাদীছ, এমন অনেক কিতাব শুনেছেন যেগুলো তিনি নিজে লিখে রাখেননি এবং সেগুলোর কোন অনুলিপি সংগ্রহ করেন নি। সে ক্ষেত্রে তিনি তার সফরসঙ্গী আবু আলী ইবন ওযীরের অনুলিপির উপর নির্ভর করতেন। কারণ তাদের দু'জনের মাঝে এমন একটা সমঝোতা ছিল যে, যা ইবন ওযীর নকল করতেন সেগুলো আমার আব্বা করতেন না। আর যেগুলো আমার আব্বা নকল করতেন সেগুলো ইবন ওযীর করতেন না।

একবার আমি কোন এক চাঁদনী রাতে জামে মসজিদে বসে আব্বার কথা শুনতে পেলাম, তিনি তাঁর এক সাথীকে আফসোসের সাথে বলছেন, আমার অনেক সফর তো এমন, যেগুলো আমি করেও যেন করিনি। অনেক হাদীছ ও হাদীছের গ্রন্থ এমন, যেগুলো আমি শুনেও যেন শুনিনি। কেননা, সেগুলোর কোন অনুলিপি বা কপি আমার সংগ্রহে নেই। আমি ভেবেছিলাম, আমার সফরসঙ্গী ইবন ওযীর বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী ইত্যাদি কিতাব ও বিভিন্ন কিতাবের অংশ বিশেষসহ আমার শ্রুত অন্যান্য হাদীছের অনুলিপি আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আফসোস, ঘটনাক্রমে তিনি 'মারভে' বসবাস করতে লাগলেন এবং সেখানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

এরপর আমি অনেক আশা করছিলাম একজন নতুন সফরসঙ্গী যার নাম ইউসুফ বিন ফারওয়া আল-জিয়ানী এবং পুরোনো এক সফরসঙ্গী আবুল হাসান আল-মুরাদীর সাক্ষাত লাভের। কেননা, ইলম ও হাদীছ অর্জন ও সংরক্ষণে তার আগ্রহ ছিল প্রবল। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি একবার দামেস্কে সফর করলাম। পরে নিজের দেশ আন্দালুসে ফিরে দেখলাম, এ এলাকার কেউ দামেস্কে সফর করে না। অথচ সেখানে যেমনি রয়েছে হাদীছের ব্যাপক চর্চা, তেমনি রয়েছে ইলমের বিশাল বিশাল ভাণ্ডার। তখন আমার মনে হলো, আবার আমাকে দামেস্কে সফর করতে

হবে, অর্জন করতে হবে বড় বড় কিতাব এবং দামেস্কের মূল্যবান ও বিরল জ্ঞান।”

আব্বাজীর এমন আফসোস ও ব্যথিত মনের এসব কথা বলার কিছু দিন পরই তাঁর এক সাথী আমাদের এলাকায় এলেন। খবর পাওয়া মাত্র আব্বা ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। তাকে আমাদের ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি আমাদের কাছে তাঁর শ্রুত হাদীছের চার থলে ভর্তি কিতাব নিয়ে এলেন, আব্বা এতে অত্যন্ত প্রীত হলেন। কষ্ট-ক্লেশহীনভাবে আল্লাহ এ সম্পদ তাঁর হাতে এনে দিয়েছেন বলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং তাঁর সে সাথীর সফরের পূর্ণ ব্যয়ভার নিজেই বহন করলেন এবং সেগুলো থেকে নিজের শ্রুত হাদীছগুলো অনুলিপি করতে শুরু করলেন। একেকটি খণ্ড যখন হাতে নিতেন, তিনি এতটাই আনন্দিত ও পুলকিত হতেন, এতই তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হতেন, মনে হত যেন তিনি সারা দুনিয়ার রাজত্ব হাতে পেয়ে গেছেন। (এ পর্যন্তই হল তিনটি কিতাব থেকে উদ্ধৃত হাফেয ইবন আসাকির র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।)

প্রিয় পাঠক! এ জীবনীতে তুমি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর যা কিছু পেয়েছো, হতবুদ্ধিকর ও প্রায় অসম্ভব যে কর্মযজ্ঞের কথা জেনেছো, তার কিছুই সম্ভবপর হত না এবং কোন কিছুই ঘটত না যদি তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার না করতেন, প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তের মূল্যায়ন না করতেন। না হতো এতো সব হাদীছের সংরক্ষণ, আর না হতো এমন বিশাল বিশাল গ্রন্থ সংকলন, যার বিশালতাই বলে দেয়– বর্তমান যুগের কোন ইলমী একাডেমীও তা ছাপতে হিমশিম খাবে, সংকলন তো অনেক দূরের কথা।

সুতরাং হে বন্ধু! সময়ের সদ্ব্যবহার কর, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের যথার্থ মূল্যায়ন কর। কেননা, এই সময়ই তো হল কল্যাণ ও প্রাচুর্যের উৎস। তুমি যত পার তা থেকে প্রাচুর্য অর্জন কর, যত পার কল্যাণ সংগ্রহ কর।

উপযুক্ত সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

সময়ের সদ্ব্যবহার ও তার যথাযথ মূল্যায়নকারী মনীষীগণের খণ্ড জীবনীর আলোচনায় কিতাবটি এখানেই সমাপ্ত হতে পারতো। কিন্তু আমি চাচ্ছি এর পরিসমাপ্তি খানিকটা বিলম্বিত করতে; সময় সংরক্ষণের কিছু কার্যকর পথ ও পন্থার আলোচনার পরে।

সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেদিকে দৃষ্টি দেয়া বিশেষ প্রয়োজন তা হল, ইলমী কাজগুলোকে সেগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা হিসেবে উপযোগী সময়ে আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করা।

কিছু ইলমী কাজ রয়েছে যে কোন সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে সেগুলো আদায় করা যায়। সেগুলোর জন্য খুব বেশী মনোযোগ ও সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। যেমন, কোন কিছুর অনুলিপিকরণ, কিংবা সাধারণ মুতালা'আ ও অধ্যয়ন। এসব কাজে সজাগ মস্তিষ্ক, পূর্ণ সতর্কতা কিংবা সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা-ভাবনার দরকার হয় না।

পক্ষান্তরে কিছু কাজ এমন রয়েছে, যেগুলো এমন সময় ছাড়া পূর্ণরূপে আঞ্জাম দেয়া যায় না, যখন মস্তিষ্ক সজাগ ও সক্রিয় থাকে, মেধা ও মেজায প্রফুল্ল থাকে, যখন মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হয় আর আসমান থেকে বরকত নাযিল হয়। যেমন, খুব ভোরে, রাতের শেষ প্রহরে, কিংবা সকালে ও রাতে যখন সময়ের নীরবতা ও স্থানের নির্জনতা একাকার হয়ে যায়। কোন কিছু মুখস্থ করার জন্য, কঠিন ও জটিল বিষয় বোঝার জন্য, সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য কিংবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভুল ও বিকৃতির সংশোধনের জন্য এসকল সময়ের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন।

হাফেয খতীব বাগদাদী র. তাঁর الفقيه والمتفقّه নামক গ্রন্থে হেফয (মুখস্থ) করার সর্বোত্তম সময় ও তার জন্য উপযোগী স্থানের ব্যাপারে আলোচনা করতঃ উল্লেখ করেন, "জেনে রাখ! কোন কিছু মুখস্থ ও আয়ত্ত করার কতক নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যারা কোন কিছু হিফয বা মুখস্থ করতে চায় এবং অল্প সময়ে বেশী কিছু আয়ত্ত করতে চায়, তাদের উচিৎ উল্লিখিত সময়গুলোকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা এবং সে স্থানগুলোতে সর্বদা অবস্থানের চেষ্টা করা।

হেফযের উপযুক্ত সময়গুলো হল, রাতের শেষ প্রহর বা সাহরীর সময়। অতঃপর দিনের প্রথম ভাগ, তারপর দিনের অন্যান্য সময়। তবে দিনের চেয়ে রাত এবং পরিতৃপ্তির মুহূর্ত থেকে ক্ষুধার মুহূর্ত, হিফযের জন্য অধিক উপযোগী। তাই হেফযকারী বা হেফয প্রত্যাশীর জন্য ক্ষুধার সময়গুলোর খোঁজে থাকা এবং সে অবস্থাকে নিজের মাঝে ধরে রাখায় সচেষ্ট থাকা উচিৎ। তবে তা হতে হবে অবশ্যই বিবেক চালিত; আবেগ-তাড়িত নয়। এ কথাটুকু বলার কারণ হল, কোন কোন মানুষ যখন তীব্র ক্ষুধাক্রান্ত হয় এবং তার পাকস্থলী শূন্য হয়ে পড়ে তখন সে পড়ার শক্তি ও মুখস্থ করার সাহস

হারিয়ে ফেলে। তখন কোনকিছু না হয় তার মুখস্থ, আর না পড়ায় তার মন বসে। সে সময় সামান্য কিছু খেয়ে শুধু ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করবে। তবে কিছুটা ক্ষুধা যেন বাকী থাকে। কিন্তু যদি ক্ষুধার জ্বালায় পেট পুরে খায় তবে তো তার কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত, প্রত্যাশিত সময় দীর্ঘক্ষণের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেলে। আর সবচে' উপযোগী স্থানগুলো হল, নিরিবিলি ও নির্জন স্থান। যেমন– উপরের তলার একক কোন কামরা বা কুঠুরি, লোকালয় দূরবর্তী কোন নির্জন স্থান, যে স্থানে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর কিছু নেই। যেখানে কলব সবরকম অন্যমনস্কতা থেকে মুক্ত হবে। তাই বৃক্ষপূর্ণ সবুজ স্থানে বা নদীর পাড়ে ও পথের ধারে কোন কিছু মুখস্থ করার জন্য বসা অনুচিত। কারণ এসব স্থানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরব ও নির্ঝঞ্ঝাট হয় না।[৩১]

তবে এক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিক আবু নছর আল ফারাবী র. এর ছিল ভিন্ন পথ ও ভিন্ন মত, ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন দর্শন। وفيات الأعيان গ্রন্থে ইবন খাল্লিকান এই মহান দার্শনিকের জীবনী আলোচনা করে বলেন যে, "তিনি ছিলেন আত্মসমাহিত মানুষ। জনতার মাঝেও তিনি নির্জনতা খুঁজে পেতেন। নিজে সাধারণত কারও সাথে তেমন একটা মিশতেন না, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আলাপচারিতায় লিপ্ত হতেন না। তাছাড়াও রচনা ও সংকলনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজেও তাঁর নির্জন স্থানের প্রয়োজন হতো না। দীর্ঘকাল দামেস্কে অবস্থানের সময় প্রবহমান পানির ঝরণার পাশে বা কোন বাগানে বসে কিতাব রচনা করতেন, অথচ মানুষ একের পর এক সেখানে যাওয়া-আসা করত।

উপযোগী স্থান নির্বাচন

পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইলম অন্বেষণের জন্য নির্জন ও কোলাহলমুক্ত স্থান ও পরিবেশ নির্বাচন করতেন। কেননা নীরবতা ও নির্জনতা চিন্তায় স্বচ্ছতা আনয়ন করে। আর চিন্তা-ভাবনা যখন স্বচ্ছ হয় তখন ইলমের তলবে ও জ্ঞানের অন্বেষণে উপলব্ধি ও বোধশক্তি সঠিক হয় এবং দৃষ্টিশক্তি ও পর্যবেক্ষণ একাগ্র হয়।

---

৩১ তেমনিভাবে বর্তমানে পার্ক বা মনোমুগ্ধকর দর্শনীয় স্থান। এসব স্থানগুলো যদিও সাহিত্যচর্চার জন্য উপযোগী কিন্তু হিফযের জন্য অনুপযোগী।

আর পূর্বসূরীদের জ্ঞান অর্জন সর্বদা বুদ্ধি ও বিবেকের পরিমাপে নির্ণীত হতো। আর তা এমনই সূক্ষ্ম বিষয় যে, সামান্য একটু উদাসীনতা ও অন্যমনষ্কতায় তা প্রভাবিত ও বিকৃত হয়ে যায়। তখন তো তাদের ইস্তেকামাত ও অবিচলতা এবং একাগ্রতা ও নিষ্ঠা বজায় থাকবে না। তাই তাঁরা সূক্ষ্ম-জটিল বিষয়াদির ক্ষেত্রে সময় ও স্থানের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেন। যেন তাঁদের চিন্তা ও ভাবনা এবং বুঝ ও বোধ পূর্ণ ও যথার্থ হয় আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হয়।

ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আদীব আবু সুলায়মান হামদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী র. (৩১৯-৩৮৮) ছন্দে ছন্দে বলেন–

إذا ما خلوتُ صفا ذهنى وعارضنى ✪ خواطرُ كِطراز البرق فى الظُلَمِ

وإن تَوالى صياحُ الناعقين على ✪ أذنى عَرتْنى منه حُكلةُ العجَم

অর্থ : যখন আমি নির্জনে থাকি/অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকের মত বহু ভাবনা আমার মনন জগতকে আলোকিত করে/পক্ষান্তরে যদি শোরগোল, হৈ চৈ ক্রমাগত কানে আসতেই থাকে/তবে যেন নির্বাকতা ও চিন্তার বন্ধ্যাত্ব আমাকে পেয়ে বসে।

শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টের জন্যই নিয়োজিত হও

এমন কিছু ইলম ও জ্ঞান রয়েছে যেগুলোর উপকারিতা ও নির্ভরতা এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুব অল্প। সেগুলোর অর্জনে হয়তো জ্ঞান-জগতে পূর্ণতা আসে, সমৃদ্ধি ঘটে, তবে অর্জন না করলে লোকসান বা ঘাটতি হয় না কিংবা কমতি রয়ে যায় না। এ জাতীয় বিষয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় না করা এবং মেধা ও মস্তিষ্ককে বেশী ব্যস্ত না করা উচিৎ। কেননা অশ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টে মগ্নতা তো উৎকৃষ্ট ও অত্যুৎকৃষ্টে পৌছার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক বৈ কিছু নয়। তা ছাড়া এতে সময়ও নষ্ট হয় এবং শারীরিক উদ্যম ও মানসিক আগ্রহও স্তিমিত হয়ে যায়। ফলে মানুষ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টে পৌছতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আরব কবি ছালেহ বিন আবদুল কুদ্দুছ র. বলেছেন–

و إذا طلبتَ العلمَ فاعلمْ أنه ✪ حملٌ فأبصرْ أيَّ شئ تحمل

وإذا علمتَ بأنه متفاضل ✪ فاشغلْ فؤادَك بالذى هو أفضل

অর্থ : জ্ঞান যদি অন্বেষণ করতে চাও তবে জেনে রাখ, তা কিন্তু একটি বোঝা/সুতরাং ভেবে দেখ, কিসের বোঝা তুমি বহন করছ।/আর যখন তুমি বুঝতে পারছ তার মাঝে মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে/তখন তোমার উচিৎ সর্বোৎকৃষ্টের জন্যই তোমার কলবকে মশগুল করা।

সুতরাং প্রতিটি মানুষের এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উচিৎ তার মন ও মস্তিষ্ককে, মেধা, মনন ও চিন্তা-ভাবনাকে এবং মূল্যবান সম্পদ সময়কে শ্রেষ্ঠতর কর্ম এবং উৎকৃষ্টতর উপার্জনে ব্যয় করা। তাহলেই সে পেতে পারে শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান।

প্রয়োজনে আত্মপ্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ

এক কথায় বলা যায়, প্রতিটি মানুষের, বিশেষত যারা বড় হতে চায়, জীবনকে গড়তে ও সাজাতে চায়, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হতে চায়, তাদের উচিৎ বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে, বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে সময়-সম্পদকে ব্যয় করা-সুস্থতা বা অসুস্থতা, প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা, সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি যে কোন অবস্থায়, যে কোন মুহূর্তে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাহ্যিক আত্মপ্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করাও নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়।

আবু হেলাল আসকারী র. রচিত الحثُّ على طلب العلم গ্রন্থে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নাহব-বিদ ইবন জারউ আল-মাওছিলি র. এর একটি উক্তি উল্লেখ করা হয়, তিনি বলেন–

ينبغي أن يؤخِّر الإنسانُ درسَه للأخبار والأشعار لوقت مَلله —

অর্থ : মানুষে উচিৎ তথ্য ও কাব্যের অধ্যয়নকে তার ক্লান্তি ও বিরক্তির মুহূর্তের জন্য রেখে দেয়া।

আরেকজন সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ ইবনুল মারাগী র. বলেন–

ينبغي أن يُخادع الإنسانُ نفسَه في الدرس —

অর্থ : মানুষের উচিৎ অধ্যয়নের স্বার্থে (প্রয়োজনে) আত্ম-প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা।

(শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. বলেন) সম্ভবত এ কথার ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, মানুষ যখন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়ে, দুর্বলতা ও অবসন্নতা তাকে পেয়ে বসে তখন তাকে (অর্থাৎ, ক্লান্তি ও বিরক্তিকে) প্রশ্রয় দিতে নেই, তার আহ্বানে দেহ মনকে সাড়া দেয়ার সুযোগ দিতে নেই; বরং

অবসন্নতার প্রতিবিধান করা উচিৎ। ক্লান্তি ও বিরক্তির সাথে দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা এবং যে কোন উপায়ে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। যেন সেগুলো দূরীভূত হয়ে যায় এবং দেহ-মনে প্রফুল্লতা ও উদ্যম ফিরে আসে।

এই ক্লান্তি ও বিরক্তি দূর করার এবং তন্দ্রা ও অলসতার প্রতিবিধান করার বিভিন্ন উপায় হতে পারে। যেমন, লোবান বা চুইংগাম জাতীয় কিছু চিবানো। ছাদের নীচ ছেড়ে খোলা ময়দানে, উন্মুক্ত পরিবেশে বের হওয়া, বিভিন্ন কামরায় সামান্য পায়চারী করা, ঠাণ্ডা বা গরম পানিতে গোসল করা কিংবা হাত-মুখ ধুয়ে নেয়া, সামান্য কিছু পানাহার করা বা বন্ধু ও সহপাঠীর সাথে অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলা, উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত বা কবিতা আবৃত্তি করা ইত্যাদি।

আবার কখনো বসার অবস্থা বা অবস্থান পরিবর্তন করা, একটু ওঠাবসা বা উঁচুতে আরোহণ করা কিংবা পঠিত কিতাব বা বিষয় পরিবর্তন করা ইত্যাদি মাধ্যমেও উপকার পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিটি দেহেরই সংশোধন এবং দেহের প্রতিটি অবস্থা ও প্রতিটি শূন্যতারই পরিবর্তক ও পরিপূরক রয়েছে। জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী, মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই সেগুলো জানেন। সবগুলোর আলোচনা বোধ হয় এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ইলমের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোতেই মগ্ন হও

আমাদের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত, সময় অতি অল্প, কিন্তু জ্ঞান-সাগরের পরিধি ও গভীরতা এবং ইলমের ভাণ্ডারের ব্যাপ্তি ও বিশালতা তো সীমাহীন, অপরিমিত। তাই আমাদের উচিৎ ইলমের গুরুত্বপূর্ণ দিক ও অত্যাবশ্যকীয় শাখাগুলোর মাঝেই ব্যস্ত ও মগ্ন হওয়া। যেমনটা বলেছেন হাফেয খতীব বাগদাদী র.-

العلم كالبحار المتعذِّر كيلُها، والمعادن التي لا ينقطع نيلُها، فاشتغلْ بالمهمِّ منه، فإنه مَنْ شغل نفسَه بغير المهمّ أضرّ بالمهمّ —

অর্থ : ইলম ও জ্ঞানের পরিধি তো সু-বিশাল সাগরের মত, যা পরিমাপ করা যায় না এবং সুবৃহৎ খনির মত যার খনিজ দ্রব্য কখনো শেষ হয় না। সুতরাং তার গুরুত্বপূর্ণ অংশে নিয়োজিত হও। কেননা, গুরুত্বহীন বিষয়ে মশগুল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অর্জনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিচক্ষণ আলেম বিজ্ঞ কবি ও সাহিত্যিক আব্বাস ইবন হাসান আলাভী র. এক মূল্যবান নছীহতে একথার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আমি তাঁর পুরো উপদেশ বাণীটিই এখানে উল্লেখ করা পাঠকের জন্য ভাল ও উপকারী মনে করছি। কেননা, তাতে রয়েছে সূক্ষ্ম-গভীর চিন্তার নির্যাস এবং আগ্রহীদের জন্য জ্ঞানের মূল্যবান খোরাক।

তিনি বলেন, "জেনে রাখ, তোমার মেধা ও মস্তিষ্ক জ্ঞানের সকল শাখা, এমনকি কোন একটি শাখার সকল প্রশাখাকেও পরিবেষ্টন করতে পারবে না। তাই তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়েই ব্যস্ত রাখ। কেননা, গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মস্তিষ্ককে তুমি যতটা সক্রিয় করবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ততই অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হবে।

আর তোমার ধন-সম্পদ সকল মানুষকে অভাবমুক্ত করে দিতে পারবে না। তাই শুধু হক্বপন্থীদের জন্যই তা ব্যয় কর। কেননা, যখন তুমি সম্পদকে অন্যায় পথে ও অসৎ জনে ব্যয় করবে, তখন সৎপথে ও সৎজনের জন্য ব্যয় করতে চাইলেও তুমি তা পাবে না।

আর তোমার সম্মান-মর্যাদা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে না। শাব্দিক অর্থেই সবাই তোমার মর্যাদা বুঝবে না এবং তোমাকে সম্মান করবে না। সুতরাং তুমি শুধু গুণবান ও মর্যাদাবানদের থেকেই তা কামনা কর। কেননা যখন তুমি হীন ও নীচ লোকদের থেকে সম্মান ও মর্যাদা কামনা করবে তখন গুণবান ও মর্যাদাবানদের কাছে তোমার অবস্থান হারাবে।

আর দিন-রাত্রিতে তুমি যদি অবিরাম পরিশ্রম করে চল, অধ্যবসায়ী হয়ে কাজে আত্মনিয়োগ কর তবুও তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে না, কাজ ফুরোবে না। তাই কাজ ও সহনীয়তার মাঝেই দিন-রাতকে ভাগ করে নাও এবং প্রয়োজনীয় কাজেই মশগুল থাক। কেননা, যখন তুমি অপ্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাকবে তখন স্বভাবতই প্রয়োজনীয় কাজ তোমার হাতছাড়া হবে।"

সালাফের জীবনী অধ্যয়ন কর

এ হল পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমদের চিন্তা ও চেতনা, তাঁদের ভাব ও ভাবনা এবং সময়ের ব্যাপারে তাঁদের মূল্য ও মূল্যায়নের কতক খণ্ডচিত্র। বরং বলা ভাল, তাদের বহুজন থেকে অল্প ক'জনের জীবনের সামান্য অংশের উপর একটি ত্বরিত দৃষ্টি মাত্র। সবার কৃতিত্ব ও গুণাবলীর উল্লেখ করা হলে তো

এটি শত খণ্ডের বিশাল গ্রন্থে পরিণত হবে এবং এর রচনায় একাধিক জীবনকালের প্রয়োজন হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তো ছিলেন ইসলামের গৌরব, বরং সমগ্র মানবজাতি ও মানবতার গৌরব।

কবি কত সুন্দর করে বলেছেন,

أولئك قومٌ شيَّد الله فخرَهم ✪ فما فوقه فخرٌ وإن عَظُم الفخرُ

অর্থ : আল্লাহ তাঁদের গৌরবকে করেছেন সুদৃঢ় ও সমুন্নত/এর উর্ধ্বে নেই কোন গৌরব, হোক না তা বিশাল ব্যাপ্ত।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

যৎসামান্য আলোচনায় যা কিছু উল্লেখ করা হল এরপর তো আর পাঠকের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, যদি তিনি শোনেন যে, অমুক আলেম শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন বা অমুকের রচনা-সম্ভার জ্ঞানের সকল বিষয়ের আলোচনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ কিংবা এ জাতীয় কিছু। এ ধরনের কর্ম-কীর্তি বা বক্তব্যকে অসম্ভব মনে করারও কিছু নেই। কেননা, এর হেতু বা কারণ, উপায় ও উপকরণ তো জানা হয়ে গেছে- তাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন, অহেতুক অনর্থক কাজ থেকে বিরত থেকেছেন, জীবনের সংক্ষিপ্ততা ও সময়ের গতিধারা সম্পর্কেও সজাগ থেকেছেন। প্রতিটি ঘণ্টা-মিনিট, এমনকি প্রতিটি মুহূর্তের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতিযোগিতা করেছেন। ফলে এ সকল মহা কীর্তি ও স্মরণীয় কর্ম তাঁরা আঞ্জাম দিতে পেরেছেন।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

উস্তায জামীলুল আ'জম দামেস্কী র. (মৃত্যু-১৩৫২ হিজরী) একটি কিতাব লিখেন, যার নাম عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفا فمئة فأكثر এতে তিনি এমন বহু ওলামায়ে কেরামের কথা উল্লেখ করেন যাঁরা বহু গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। যেমন ইবন জারীর তাবারী, ইবনুল জাওযী, ইমাম নববী, ইবন সীনা, ইমাম গাযালী, ইবন হাজার আসকালানী, বদরুল আইনী, সুয়ূতী, ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, আলী ক্বারী, শায়খ মুনাভী, আব্দুল গণী নাবলুসী, আব্দুল হাই লাখনুভীসহ আরও অনেকের– যাদের প্রত্যেকেরই গ্রন্থ সংখ্যা পঞ্চাশ বা একশ'র উপরে– তাঁদের জীবনী বা জীবনীর অংশ বিশেষ উল্লেখ করেন।

এ ধরনের গ্রন্থ ও এ জাতীয় মনীষীদের জীবনী যখন কেউ পড়বে তখন স্বভাবতই তা তাকে উদ্বুদ্ধ করবে সময়ের মূল্য উপলব্ধি করণে এবং তার

যথাযথ মূল্যায়নে। পাঠক যদি দৃঢ় মনোবল ও কঠিন সংকল্পের অধিকারী হন তবে– আল্লাহ চান তো– তিনিও তাঁদের কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন, তাঁদের দলে শামিল হতে পারেন। তিনিও রেখে যেতে পারেন ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থ।

ويزيد الله في الخلق ما يشاء، ويختصُّ برحمته مَنْ يشاء والله واسع عليم —

(তরজমা : আল্লাহ সৃষ্টির মাঝে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন। আর তিনি তো মহা দানশীল ও মহাজ্ঞানী।)

উচ্চমর্যাদা অন্বেষীর গুণাগুণ

সময় সংরক্ষণে, তার সদ্ব্যবহারে এবং তা থেকে যথাযথ উপকার লাভের দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তীগণ আদর্শ তালিবে ইলমের-যে নিজেকে ইলম অর্জনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে চায় এবং তাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়– কিছু অবস্থা ও কতক গুণাগুণ উল্লেখ করত বলেন :

إنه ينبغى أن يكون سريعَ الكتابةِ، سريعَ القراءة ، سريعَ المشى

প্রকৃত তালিবে ইলম লেখায়,
পড়ায় ও চলায় দ্রুত গতি সম্পন্ন হওয়া উচিৎ।

দ্রুত চলার উপকারিতা হল, সে অল্প সময়ে বিভিন্ন শায়েখের কাছে যেতে পারবে এবং তাঁদের দরবারে হাজির হতে পারবে। আর দ্রুত লেখা ও পড়া তো হল সময়ের হিফাযতের জন্য এবং অল্প সময়ে বেশী কাজ করার ও অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য। নিঃসন্দেহে এই গুণগুলো একজন তালিবে ইলমকে অল্প সময়ে অধিক 'পাথেয়' অর্জনে সহযোগিতা করবে।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, আমি তার সাথে চতুর্থ একটি গুণ যোগ করতে চাই। আর তা হল, পানাহারে দ্রুততা। কেননা যদি সে দ্রুত খাবার গ্রহণ না করে, বরং তাতে প্রবল আসক্তি রাখে এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করে, তবে দ্রুত পড়ে, লিখে ও চলে যে সময় সে সঞ্চয় করবে তার সব বা অধিকাংশই তো খাবার আয়োজন ও তা গ্রহণেই চলে যাবে। তখন পূর্বের নসীহতের উপর আমলও তার জন্য তেমন ফলপ্রসূ হবে না।[৩৬]

---

৩৬ কাযী ইয়ায র. তাঁর الشفاء بتعريف حُقُوْق المصطفى গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, পূর্ববর্তী আরবগণ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ খাবার ও ঘুমের স্বল্পতা নিয়ে

ইমাম নববী র. তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ المجموع এর ভূমিকায় লিখেন, "প্রত্যেক তালেবে ইলমকে প্রতি মহূর্তে ইলমের প্রতি আগ্রহী ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। দিন ও রাতে, আবাসে ও প্রবাসে ইলমের অর্জন বা তার ভাবনা ছাড়া একটি মুহূর্তও যেন অতিবাহিত না হয়– শুধু পানাহার, ঘুম ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত। আর তাও হতে হবে নিতান্তই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে, প্রয়োজন পরিমাণে এবং পরিমিত সময়ে।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

পরস্পর গর্ব ও বড়াই করতেন। আর সে দু'টির আধিক্যকে নিন্দা ও ঘৃণা করতেন। কেননা পানাহারের আধিক্য অতিলোভ ও লালসার প্রমাণ বহন করে এবং মন-মানসিকতায় স্থবিরতা ও দেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে পরিমিত আহার অল্পেতুষ্টি ও আত্মসংযম প্রমাণ করে এবং তা দেহে সুস্থতা, চিন্তা-ভাবনায় স্বচ্ছতা ও মেধায় প্রখরতা দান করে।

তেমনিভাবে ঘুমের আধিক্যও দুর্বলতা, নির্জীবতা, নির্দয়তা, উদাসীনতা এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধির কারণ। আর জীবন ও সময় তো কর্মহীনতায় নষ্ট হয়ই। এ দু'টোর মাঝে একটি মিলও রয়েছে যে, অধিক ঘুম, বেশী খাওয়া-দাওয়া থেকেই হয়ে থাকে।

লোকমান হাকীমের হিকমতপূর্ণ কথার একটি এটিও যে,

يا بنيَّ إذا امتلأتْ المعدةُ نامتْ الفكرةُ وخرستْ الحكمةُ وقعدتْ الأعضاءُ عن العبادة

অর্থ ঃ হে বৎস, যখন উদর পূর্ণ হবে তখন চিন্তা-ভাবনা নির্বাপিত হয়ে যাবে। হিকমত বিদায় নেবে এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইবাদত-বন্দেগীতে অক্ষম হয়ে পড়বে।

সুফিয়ান ছাওরী র. বলেন- بقلّة الطعام يملك سهر الليل "পানাহারের স্বল্পতা দ্বারাই রাতজাগা সম্ভব" বা "রাত জাগতে চাও, তবে খাবার/পানাহার কমিয়ে দাও।"

ছাহনূন র. বলেন, لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع "ইলম অর্জন তার কাজ নয়, যে উদরপূর্ণ করে আহার করতে থাকে।

উমর রা. বলেন, "উদরপূর্ণ আহার ও অতিভোজন থেকে তোমরা বিরত থাক। কেননা, তা অলসতা আনয়ন করে, রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি করে, দেহ-কাঠামো ও মন-মানসিকতা বিগড়ে দেয়। বরং আহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, এতে তুমি অপচয় থেকে বাঁচবে, তোমার দেহ-মন সুস্থ থাকবে, কাজে-কর্মে ও ইবাদত-বন্দেগীতে উদ্যম ও সতেজতা আসবে। আর জেনে রাখ, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত বরবাদ ও ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে ধার্মিকতা, দ্বীনদারী ও আবদিয়্যাতের উপর কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দেয়।"

আল্লামা সুয়ূতী র. এর জীবনীতে দেখা যায়, তিনিও তালেবে ইলমের জন্য দ্রুত লেখা, পড়া ও চলার সাথে দ্রুত খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন- সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তিতে তিনি সে কথাই বলেছেন,

حَدَّثنا شيخُنا الكنانيٌّ ✪ عن أبيه صاحب الخطابة

أسرعْ أخا العلمِ فى ثلاثٍ ✪ الأكل والمشْى والكتابة

আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, শায়খ কিনানী
তাঁর খতীব পিতা হতে এক উপদেশবাণী
ওহে জ্ঞান-অন্বেষী খাওয়া, চলা ও কলম চালনা।
এই তিন কাজে হও তুমি দ্রুতগামী।

সুতরাং বন্ধু! তোমার নিজের কল্যাণেই প্রতিটি মুহূর্তকে নষ্ট ও নিষ্ফল হওয়া থেকে তোমার হেফাযত করতে হবে। কারণ তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত হল একেকটি পাত্র, তাতে যা তুমি রাখবে তা-ই তোমার জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

বন্ধু! সময়ের ব্যাপারে একটু সজাগ হও। তা তো সদা বহমান ও ক্ষণস্থায়ী, চলে যাচ্ছে এবং যাবে; কখনো ফিরে আসবে না।

কবি কত সুন্দর বলেছেন,

ما مضى فاتَ، وَالمؤمَّل غيبٌ ✪ ولك الساعةُ التى أنتَ فيها

(জীবনের) যা অতীত হয়েছে তা হাতছাড়া হয়েছে, আর ভবিষ্যৎ তো অদৃশ্য, সুতরাং তোমার জন্য রইল শুধুই বর্তমান।

সুতরাং বন্ধু, সময় সম্পদের হেফাযতে তুমি আগ্রহী হও, বরং অত্যাগ্রহী হও। নিজেকে সুবিন্যস্ত এবং নিজের কাজগুলোকে সুশৃঙ্খল করার মাধ্যমে তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট হও। চাই তুমি ছাত্র হও কিংবা শিক্ষক, পাঠক হও বা লেখক, কিংবা হও তুমি আবেদ ও সাধক। সময় সম্পদকে নষ্ট ও অপচয় করে তুমি নিজের প্রতি জুলুম করো না। প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তকে বধ করে তুমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিও না, অলসতা ও আরাম আয়েশে আসক্ত হয়ে নিজের সাথে প্রতারণা করো না। মান-মর্যাদা ও উত্তম গুণাবলী থেকে উদাসীন হয়ে জীবনের ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়ো না।

ইবনুল জাওযী (রহ.) এর উপদেশ

ইমাম আবুল ফারায ইবনুল জাওযী র. لفتةُ الكبد في نصيْحة الولَد নামক গ্রন্থে– যা তিনি নিজ সন্তানকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে লিখেছেন– তাতে উল্লেখ করেন– "গুণ ও মর্যাদা অর্জনে অলসতা এবং সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ থেকে বিমুখতা কতই না নিকৃষ্ট সাথী, কতই না মন্দ সহচর। আরাম ও বিশ্রামপ্রিয়তা সর্বক্ষেত্রেই এমন অনুতাপ ও অনুশোচনা ডেকে আনে যার প্রচণ্ডতা সকল স্বাদ ও তৃপ্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তুচ্ছ করে দেয়। সুতরাং তুমি সজাগ হও, সতর্ক হও এবং নিজের উপকারার্থে মেহনত ও মোজাহাদা করে যাও। ইতোপূর্বে যে শিথিলতা ও অবহেলা হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হও এবং যতটুকু সাধ্যে কুলায়, সময় যেটুকু সহযোগিতা করে পুণ্যবান ও পূর্ণতাপ্রাপ্তদের সঙ্গ লাভের এবং তাঁদের দলে শামিল হওয়ার জন্য চেষ্টা ও সাধনা কর। তোমার 'শাখা-প্রশাখায়' পানি সিঞ্চন করতে থাক যতক্ষণ সেগুলো সজীব থাকে এবং সেগুলোর মাঝে সজীবতা বিরাজ করে। তুমি তোমার হারিয়ে যাওয়া এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়গুলোর কথা স্মরণ কর, যার সাথে হারিয়ে গেছে তোমার অলসতা ও অবহেলার স্বাদ এবং যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জনের সুযোগ । নিজের শিক্ষার জন্য এবং উপদেশ গ্রহণের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

কখনো কখনো ইচ্ছা ও সংকল্প শিথিল হয়ে যায়, তখন যদি তাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা যায় তবে আবার তা জেগে ওঠে এবং অগ্রসর থাকে।

হিম্মত ও সাহসিকতায়, আযম ও দৃঢ় ইচ্ছায় স্থবিরতার কারণ হিসেবে অনেকেই নীচু চিন্তা ও নিকৃষ্ট মনোভাবকে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় মনোবল ও অভিপ্রায় যখন প্রবল ও উন্নত হবে তখন তা তুচ্ছ বা নিকৃষ্টে তুষ্ট ও তৃপ্ত হতে পারে না। যেমনটা কবি বলেছেন–

إذا ماعلا المرءُ رامَ العُلا ✪ ويقنعُ بالدونِ من كان دُونا

উচ্চতার অধিকারীই উচ্চতার প্রত্যাশী হয়,
আর যে নীচ, সেই নীচুতায় তুষ্ট হয়।

এরপর জেনে রাখ হে বৎস! গুণ, মর্যাদা ও ফযিলতের রয়েছে বিভিন্ন স্তর। আর এ ক্ষেত্রে মানুষের বিচার-বিবেচনাও বিভিন্ন রকম। তাছাড়া যারা চেষ্টা-

সাধনা ও মেহনত-মোজাহাদা করে তাদের সবার কামনা-বাসনা এক রকম নয়। কেউ ফযিলত মনে করে দুনিয়া বিমুখতায়, কেউ বা মনে করে ইবাদত মগ্নতায়। তবে প্রকৃতপক্ষে গুণ ও মর্যাদার পূর্ণতা হলো, ইলম ও আমলের সমন্বয়ে। উভয়টা যখন একই সাথে কারো অর্জিত হয় তখন সে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। আর এটাই হওয়া উচিৎ একজন মুসলমানের– বিশেষত একজন তালিবে ইলমের– চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আর জেনে রাখ, সংকল্প ও মনোবল যতটা দৃঢ় হয় মানুষের প্রাপ্তিও ততটা বেশী হয়। তাই তোমার মনোবল হওয়া দরকার অত্যুচ্চ, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিৎ অত্যন্ত প্রবল।

আর এখন তো দেখা যায়, কেউ কেউ ইবাদত-বন্দেগী, যুহদ্ ও দুনিয়া বিমুখতার মাঝেই মজে থাকে। আর কেউবা থাকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্জন ও অনুশীলনে মগ্ন। কিন্তু ইল্মে-কামিল ও আমলে-কামিলের ইজতেমা' এখন বড় দুস্প্রাপ্য। অথচ এটাই প্রকৃত সফলতা। সে পথেই হওয়া উচিৎ তোমার চেষ্টা ও সাধনা এবং প্রার্থনা ও আরাধনা।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

মানুষ যা কিছু চায় তার সবই প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য হয় না। আর সবার চাওয়া সব সময় পাওয়ায় পরিণতও হয় না। এমন কি কাজের সূচনাকারীও সব সময় কাজ শেষ করতে পারে না। যেমন আরব কবি আবুত্তায়্যিব বলেছেন,

وما كلُّ هاوٍ للجميل بفاعلٍ ✪ ولا كلُّ فعَّالٍ له بمتمِّمِ

ভাল কাজে আগ্রহী সকলে তা করতে পারে না, তদ্রূপ প্রত্যেক সূচনাকারীও তা সম্পন্ন করতে পারে না।

কিন্তু এরপরও বান্দার উচিৎ পরিশ্রম ও সাধনা করে যাওয়া। ভাগ্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে হাল ছেড়ে বসে না থাকা। বরং হে বৎস! তুমি যথাযথ পরিশ্রম করে যাও, এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চালিয়ে যাও, তাহলে যা তোমার তাকদীরে আছে এবং তোমাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তোমার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।

(وكلٌّ ميسَّر لما خُلِق له، والله المستعانُ سبحانه)

(ইমাম আবুল ফারায ইবনুল জাওযীর বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হল)

সময় সংরক্ষণে সহযোগী বিষয়াবলী

প্রিয় পাঠক! সময়ের সদ্ব্যবহারে যে বিষয়গুলো তোমার সহযোগী হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে তোমার অবগত থাকা দরকার। তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করছি,

- দিনের কাজগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ও প্রাত্যহিকসূচী মাফিক সম্পন্ন করা।
- অর্থহীন ও বেফায়দা মজলিস থেকে বিরত থাকা।
- যে কোন ক্ষেত্রে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করা।
- যারা পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী, বিচক্ষণ ও মেধাবী এবং সময়ের ব্যাপারে সাবধানী ও দূরদর্শী তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভে সচেষ্ট হওয়া।
- পূর্ববর্তী মনীষীগণের, বিশেষত অনন্য সাধারণ আলেম উলামার জীবনী অধ্যয়ন করা যা তোমার মাঝে উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগাবে।
- ইলমী কোন বিষয়ের উদ্ভাবন ও কোন কাজ আঞ্জামের মাধ্যমে সময় হেফাযতের স্বাদ লাভে সচেষ্ট থাকা।
- জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও জানার পরিধির সম্প্রসারণে এবং বিভিন্ন বিষয়ের পঠন ও অধ্যয়নে যথাসম্ভব নিমগ্ন থাকা।

এসব বিষয়গুলো তোমাকে সময়ের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, তোমার মাঝে সময়ের সদ্ব্যবহারের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করবে এবং তোমার মানসিকতা এভাবে গড়ে দেবে যে, তুমি শুধু এর সদ্ব্যবহারই করবে, নষ্ট করবে না। এর থেকে উপকৃত হবে, কিন্তু কখনো এর অপচয় করবে না।

হাসানুল বান্না র. তো এভাবে বলেছেন,

مَن عرَف حقَّ الوقت فقدْ أدركَ الحياةَ، فالوقتُ هو الحياةُ ــ

অর্থ ঃ যে সময়ের প্রাপ্য বুঝল সে জীবনকে উপলব্ধি করতে শিখল। **কেননা, সময়ই তো জীবন।**

ইসলামী আইনবিদ, কবি ও সাহিত্যিক উমারাতুল ইউম্‌না র. (মৃত্যু ৫৬৯ হিজরী) তাঁর এক কবিতাতে লিখেন,

إذا كان رأسُ المالِ عمرَكَ فاحترزْ ✪ عليه من الإنفاق في غيرِ واجب

فبيْنَ اختلافِ الليل والصبح معركٌ ✪ يكرُّ علينا جيشُه بالعجائب

অর্থ : সর্বসাকুল্যে মূলধন যেহেতু তোমার এই জীবনকাল। সুতরাং তুমি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ব্যতীত তা ব্যয় করো না। (আর জেনে রাখ) দিন-রাতের আবর্তনের মাঝে রয়েছে এক যুদ্ধক্ষেত্র, যার যোদ্ধারা প্রতিনিয়ত আমাদের উপর আশ্চর্যজনক 'অস্ত্র' নিয়ে হামলে পড়ছে।

আর মিসরীয় কবি আহমদ শাওকী র. বলেন–

دقّاتُ قلبِ المرء قائلةٌ له ✪ إنَّ الحياةَ دقائقُ وثوان

فارفعْ لنفسِكَ بعد موتك ذكرَها ✪ فالذكر للانسانِ عمرٌ ثان

অর্থ : হৃদস্পন্দনগুলো মানুষকে প্রতিনিয়ত বলে চলেছে, জীবনকাল তো কতক স্পন্দন-মুহূর্তের সমষ্টি। সুতরাং এর মধ্যেই এমন কাজ করে যাও যেন মৃত্যুর পরেও তুমি স্মরণীয় হয়ে থাক। কারণ, মৃত্যু-পরবর্তী স্মরণ যেন (স্মরণীয় ব্যক্তির) দ্বিতীয় জীবন।

প্রকৃত জীবন হল যৌবনকাল

প্রকৃত জীবন ও কর্মময় জীবন তো হল জীবনের মধ্যভাগ অর্থাৎ যৌবন কাল। কেননা এই কালটিই অর্জন ও কর্মের বিস্তৃত ময়দান, দান ও উদ্ভাবনের বিশাল ক্ষেত্র। এসময় শক্তি থাকে পরিপূর্ণ, মনোবল থাকে সুউচ্চ। আর অসুস্থতা, দুর্বলতা বা কোন প্রতিবন্ধকতা! তা তো এ বয়সের ধর্ম নয়।

প্রসিদ্ধ ইমাম ও তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবন সীরীন র. এর বোন হাফছা বিনতে সীরীন র.– তিনিও ছিলেন এক মহান তাবেয়ীয়াহ্– তিনি বলেন,

يا معشرَ الشباب، خُذوا من أنفسكم و أنتم شباب

فإنِّ مارأيتُ العمل إلا فى الشَّباب

অর্থ : হে যুব সম্প্রদায়! যৌবন থাকা অবস্থায় তোমরা নিজেদের থেকে কাজ আদায় করে নাও। কেননা, আমি তো শুধু যুবকদেরকেই কর্মমুখর দেখতে পাই।

ইমাম নববী র. তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ المجموع এর ভূমিকায় লিখেছেন, "প্রত্যেক তালিবে ইলমের কর্তব্য হল, তারুণ্য ও যৌবনে ইলম অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা– যখন তার মাঝে উদ্যম, দেহে শক্তি এবং অন্ত

রে সচেতনতা থাকে। আর সে থাকে বাড়তি ব্যস্ততা ও ঝামেলা থেকে একেবারেই মুক্ত এবং বার্ধক্য ও অক্ষমতার আক্রমণ থেকে বহু দূরত্বে।”

জীবন অতি সংক্ষিপ্ত

আমাদের জীবন প্রতিনিয়ত সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়ে আসছে। একটি একটি করে দিন আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আর বয়স কমে আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু অনেক মানুষ তা বুঝতেই পারছে না। উপলব্ধিই করতে পারছে না যে, তার জীবন খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছে, তা আর ফিরে আসবে না।

ফলে সে তার মূল্যায়ন এবং তার প্রতি গুরুত্ব দানে অবহেলা করছে। কোন কিছু অর্জনে ও তা থেকে উপকার গ্রহণে উদাসীন রয়ে যাচ্ছে। যেন সে ভাবছে, জীবন তো অনেক দীর্ঘ, অনেক বিস্তৃত। তা তো চিরস্থায়ী এবং অতি ধীরগামী। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. (১৬৪-২৪১) বলেছেন,

ما شبَّهتُ الشبابَ إلا بشيئ كان في كمِّي فسقط —

অর্থ : আমি তো যৌবনকালকে শুধু উপমা দিতে পারি এমন কোন বস্তুর সাথে, যা আমার আস্তিনে ছিল, তারপর তা খোয়া গেল।

যৌবনকালকে, কাজের সময়কে তাঁর কাছে এত সংক্ষিপ্ত ও এত সামান্য মনে হয়েছে, অথচ তিনি প্রায় সাতাত্তর বছর হায়াত পেয়েছিলেন।

সত্যি বন্ধু! জীবন যতই দীর্ঘ হোক তবু তা ক্রমহ্রাসমান। যৌবন কাল যতই বিস্তৃত হোক তবু তা সংক্ষিপ্ত।

আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন, যিনি এই পরম সত্য তুলে ধরেছেন কবিতার ভাষায়,

أذانُ المرءِ حينَ الطِّفلُ يأتِي ✪ وتأخيرُ الصلاةِ إلى الممات

دليلٌ أن محياه يَسِيْرٌ ✪ كما بين الأذان إلى الصلاة

অর্থ : মানবশিশুর জন্মকালে আযান দেয়া, আর জানাযার
নামাযকে তার মৃত্যু পর্যন্ত বিলম্বিত করা
একথার প্রমাণ যে, জীবনকাল তার অতি সংক্ষিপ্ত
যেমন আযান থেকে নামায এর মধ্যবর্তী ব্যবধান।

ছাত্রদের অলস মানসিকতা

আফসোস ও পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগে ছাত্রদের মাঝে মানসিক দুর্বলতা ও আলস্য মনস্কতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা আরাম-আয়েশ কে সাধনা ও পরিশ্রমের উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। গল্পগুজব, বিলাসিতা ও অন্যান্য অনর্থক কাজকর্মকে জীবনের লক্ষ্য মনে করছে। ভোগ বিলাসকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। যার ফল হচ্ছে এই, অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনে ব্যয় করার মত সময় তাদের হচ্ছে না। এমনকি এর মানসিকতাও তাদের মাঝে বাকী থাকছে না। তাদের অবস্থাই হয়ত ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করেছেন ইমাম আহমদ বিন ফারিস র. (৩২৯-৩৯৫ হিজরী)

إذا كان يُؤذيك حرُّ المصيف ✪ ويُبس الخريف وبردُ الشتا

وُيلهيك حسنُ زمانِ الربيع ✪ فأخذُك للعلم قلْ لی : متی

অর্থ : গ্রীষ্মের উষ্ণতা, শরতের রুক্ষতা, শীতের তীব্রতা/ এসব যদি–
কষ্ট দেয় তোমায় আর বসন্তের সৌন্দর্য ও সুবাস যদি উদাসীন করে
তবে বল ভাই, ইলম অর্জন তোমার দ্বারা কখন হবে!

সময়নিষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব

আল্লামা আবুল মাআ'লী মাহমুদ আলূছী র. (মৃত্যু ১৩৪২ হিজরী) ছিলেন অতি কঠোর পরিশ্রমী ও সময়নিষ্ঠ একজন ব্যক্তি। গরমের তীব্রতা ও গ্রীষ্মের দাবদাহও তাঁকে দরস থেকে বিরত রাখতো না। আর শীতের প্রচণ্ডতা ও ঠাণ্ডার অসহনীয়তায়ও কখনো দরসে আসতে তাঁর দেরী হত না। এমন তো বহু বার হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করে আসার কারণে তাঁর অনেক শাগরেদ জিজ্ঞাসাবাদ ও তিরস্কারের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এমনটি কখনো হয়নি যে, তিনি দেরী করে এসেছেন।

তাঁর শাগরেদ আল্লামা শায়খ বাহজাতুল আসরী একদিনের ঘটনা উল্লেখ করতঃ বলেন, একবার প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনে, যে-দিন ঝড়ো হাওয়া ছিল যেমন, তেমনি প্রবল বৃষ্টি ছিল– আমি তাঁর দরসে উপস্থিত হতে পরিনি। কারণ, আমি ভেবেছিলাম, হয়ত এমন দিনে তিনি দরসে আসবেন না। কিন্তু ঘটল

তার বিপরীত। পরদিন আমি দরসে উপস্থিত হতেই তিনি ক্রুদ্ধস্বরে একটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করতে লাগলেন–

ولا خيرَ فيمَنْ عاقَه الحرُّ والبردُ ....

তার মাঝে কোন কল্যাণ নেই,
শীত গ্রীষ্ম যার প্রতিবন্ধক!

ভবিষ্যতের আশায় ধোঁকা খেয়ো না

অনেকে ধারণা করে, আগামীতে হয়ত অবসর সময় পাওয়া যাবে, ভবিষ্যতে হয়ত ব্যস্ততা ও ঝামেলা থেকে সে মুক্ত হবে, তখন সে যুবাবয়সের তুলনায় অনেক বেশী অবকাশ পাবে। কিন্তু বাস্তবতা হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

হে প্রিয় ভাই! শোন, আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির কথা বলছি যিনি ঐ বয়সে পৌঁছেছেন এবং তখনকার পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেন। তিনি[৩৭] বলেন– "তোমার বয়স যতই বাড়বে ততই তোমার দায়িত্ব বাড়তে থাকবে। বিষয় ও ব্যক্তি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এভাবে, তোমার সময় কমে আসবে, শক্তি হ্রাস পেতে থাকবে।

বাধ্যর্ক্যে সময় তো আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। দেহ আরও দুর্বল হয়ে যায় এবং সুস্থতার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে যায়। উদ্যম হ্রাস পায়, কিংবা প্রায় হারিয়েই যায়। অথচ দায়িত্ব ও ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়, কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং তুমি তোমার এই সময়টাকেই (অর্থাৎ) যুবা বয়সটাকেই কাজে লাগাও। এটাই সুযোগ। অনাগত ও অজ্ঞাত ভবিষ্যতের আশায় বসে থেকো না, তার জন্য সব কাজ ঝুলিয়ে রেখো না। কারণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই, সময়ের প্রতিটি পাত্রই কোন না কোন ব্যস্ততা, কাজ বা অপ্রত্যাশিত বিপদ-আপদে পূর্ণ হয়ে যায়।"

---

[৩৭] তিনি হলেন মুহাদ্দিছ আবু মুহাম্মাদ জাফর বিন মুহাম্মাদ আব্বাসী র. (মৃত্যু ৫৬৮ হিজরীতে) তিনি তাঁর কবরের উপর এ বাক্যটি লিখে রাখতে অছিয়ত করে যান,

حوائجُ لم تُقضَ! وآمال لم تُنل! وأنفس ماتت بحسراتها

অর্থ ঃ বহু প্রয়োজন অপূর্ণ রয়ে গেল, অনেক আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্ত রয়ে গেল। আর আক্ষেপ যাতনা নিয়েই বহু প্রাণের জীবনাবসান ঘটল।

যৌবন ও বার্ধক্য

প্রকৃতপক্ষে শক্তি ও কর্মের এবং মেহনত ও মুজাহাদার কাঙ্ক্ষিত সময়ই হল যৌবন ও তারুণ্য। তখনই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রচেষ্টার সময়। ভোগ ও প্রাপ্তির স্বচ্ছতা ও তৃপ্তি নিশ্চিত করার সময়।

তবে বার্ধক্য! তা তো হল বিভিন্ন রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, ও বাধা বিপত্তির সময়। তখন আগ্রহ যদিও বা থাকে কিন্তু উপায় থাকে না, সুযোগ মিলে না, সাহসে কুলায় না। কবির এ কথা, কে বলতে পারে, তা মিথ্যা!

إن الشبابَ الذى مجدٌ عواقبه ✪ فيه نلذّ ولا لذّات للشيب

অর্থ ঃ যৌবন, তার পরিণাম তো হল মর্যাদা ও গৌরব।
তাতে আমরা ভোগ করি, তৃপ্তি লাভ করি।
আর বার্ধক্যে না আছে কোন তৃপ্তি, না আছে প্রাপ্তি।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবু উছমান জাহিয যখন বার্ধক্য ও তার উপসর্গসমূহে আক্রান্ত হলেন তখন দুর্বলতা, আর রোগ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন,

أترْجُوْ أن تكونَ وأنت شيخٌ ✪ كما قد كنتَ أيامَ الشّبابِ

لقد كذبتْك نفسُك ليس ثوبٌ ✪ دريس كالجديد من الثياب

অর্থ : তুমি কি আশা করছ, বার্ধক্যে যৌবনের শক্তি ও উদ্যম লাভ করবে? মন তোমায় মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। জীর্ণ কাপড় তো নতুন কাপড়ের মত নয়?

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ এবং সফল ও ভাগ্যবান তো সেই, যে তার বিদ্যমান প্রতিটি সেকেন্ডকে, বর্তমান প্রতিটি মুহূর্তকে বিভিন্ন উপকারী ও ফলদায়ক কর্ম ও কীর্তি দিয়ে পূর্ণ করে রাখে।

দ্বিতীয় খলীফা উমর বিন খাত্তাব রা. কর্মহীনতা ও বেকারত্বকে এবং সময়কে অনর্থক নষ্ট করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন–

إنى لأكرهُ أن أرى أحدَكم سبهللاً – أى فارغا – لا فى عمل دنيا ولا فى عمل آخرة —

অর্থ : তোমাদের কাউকে বেকার ও কর্মহীন দেখতে আমি খুব অপছন্দ করি, যখন না থাকে সে দুনিয়াবী কাজে, আর না আখেরাতের কাজে।

সময় সহজলভ্য তবে অতি মূল্যবান

সময় একদিক থেকে সবচে' মূল্যবান, অন্যদিক থেকে সবচে' মূল্যহীন। যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার যা কিছু রয়েছে তার মধ্যে সবচে' দামী কী? উত্তর হবে : সময়! আবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি নষ্ট করতে পারো, ধ্বংস করতে পারো এমন জিনিসের মধ্যে সবচে' সস্তা ও সহজলভ্য কী? উত্তর হবে একই, তা হল– সময়।

তাই তো ফকীহ, আদীব আল্লামা ইয়াহইয়া বিন হুবায়রা র. (৪৪৯-৫৬০ হিজরী) যিনি ছিলেন ইমাম ইবনুল জাওযী র. এর শায়খ– তিনি বলেন,

والوقتُ أنفسُ ما عُنيت بحفظه ✪ وأراه أسهلَ ما عليك يَضيعُ

যা কিছুর সংরক্ষণে তুমি সচেষ্ট হতে পার তন্মধ্যে সময় হচ্ছে সবচে' মূল্যবান,

অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি, যা কিছু তোমার দ্বারা বরবাদ হয় তার মধ্যে সময় সবচে' সহজলভ্য

অবসর সময়

মিশরীয় লেখক ও সাহিত্যিক উস্তায আহমদ আমীন র. (মৃত্যু- ১৩৭৩ হিজরী) এর أوقات الفراغ (অবসর সময়) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা ভাল মনে করছি– এই আশায় যে, হয়ত কোন পাঠক তা থেকে উপকৃত হবেন– জ্ঞানের প্রাঙ্গণে বা জীবনের অঙ্গনে।

তিনি বলেন, "আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাজার হাজার ছাত্র বছরে চার-পাঁচ মাস গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটায়। তখন কি তাদের অভিভাবকগণ জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে তারা এই দীর্ঘ সময়টা কাটাচ্ছে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক গুণে সমৃদ্ধি লাভের পর এই দীর্ঘ ছুটিকে তারা কোন্ কাজে ব্যয় করেছে? তাছাড়া এ জাতির প্রায় অর্ধ-সংখ্যক মানুষ, আমাদের মেয়েরা– বাড়ী ঘরে তাদের অবসর সময়গুলো কীভাবে ব্যয় করে, তা কি জানতে চান কোন অভিভাবক?

সম্পদ ব্যবহার ও বিনিয়োগের, জ্ঞান অর্জন এবং দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা লাভের মূল উপকরণ হল সময়, অথচ আমরা কীভাবে তা নষ্ট করে চলছি!

কীভাবে আমরা আমাদের জীবনকে অযথা ও অনর্থক কাজে ব্যয় করে চলছি! যাতে না হচ্ছে দুনিয়াবী কোন ফায়দা, আর না হচ্ছে 'উখরুবী' ফায়দা!! কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা কি শুধু সময়ই নষ্ট করছি, না অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান, সুস্থতা সবকিছুই খোয়াচ্ছি? কখনো কি ভেবে দেখেছি?

সময় নষ্টের একেবারে নিকটতম পরিণতি তো এই যে, এর মাধ্যমে বহু সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়, সম্পদের বহু উৎস নষ্ট হয়ে যায়। ভেবে দেখুন, সময় সম্পদকে যদি কেউ নষ্ট না করে এবং এর সঠিক ব্যবহারে অজ্ঞ না হয় তবে তো সে বহু পতিত ও অনাবাদি জমিকে আবাদ করতে পারে, বহু কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করতে পারে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালু করতে পারে এবং সেগুলো পরিচালনা করতে পারে– সময়ের একটি অংশ ব্যয় করে।

আর যদি বর্তমান যুগে সময় নষ্টের ও তার অপচয়ের ফল দেখা হয় তবে তা হল, গ্রন্থবিমুখতা, জ্ঞানশূন্যতা, অধ্যয়নবিরূপতা ও মূর্খতাপ্রিয়তা। বর্তমানকালে তো এমন অনেকে রয়েছে যারা মূর্খতা ও জ্ঞান শূন্যতায় কোন মর্মপীড়া ও যাতনা অনুভব করে না। তাদের দেহ শুধু সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশ চায়, কষ্টের পথ মাড়াতে চায় না। অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারছে না, যে পথে তারা চলছে তা প্রকৃত পক্ষেই কষ্টের পথ, দুনিয়া ও আখেরাতে অশান্তির পথ।

সময়ের ব্যাপারে মানুষের এমন মানসিকতা ও তার প্রতি এই 'অবিচারের' ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় দেখা দেয় অল্পে তুষ্টতা এবং শুধু সহজলভ্য অংশটুকুতেই তৃপ্ততা। শুধু গদবাঁধা পড়া লেখা ও একঘেয়ে সামান্য কাজ– যাতে না আছে কোন শ্রম-সাধনা আর না আছে নতুন কোন চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশের ভাবনা– এতেই পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া। এরপর ধীরে ধীরে দেখা দেয় দুর্বল ও ক্লান্ত চিন্তা এবং কাজের ভার উদ্যমী কারও উপর ছেড়ে দিয়ে অলস বসে থাকা। ভাবখানা যেন এমন, তুমিই কর ভাই, আমার আর এ ভেজালে গিয়ে কী লাভ!

অবসর যেন বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়

সময়ের হেফাযত ও মূল্যায়ন বলতে আমি একথা বুঝাচ্ছিনা যে, তোমরা সব সময়ই কাজ আর কাজ করে যাবে, গোটা জীবনই শুধু মেহনত আর সাধনা করে যাবে, সেখানে থাকবে না কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আর না থাকবে কোন বিশ্রাম ও আনন্দ। তা হবে একেবারে শুষ্ক, কঠোর, যেন কোন গোমড়ামুখ, যাতে না আছে হাসির চিহ্ন, না আছে কোন খুশী-আনন্দ। বরং আমি বলতে চাচ্ছি, তোমাদের জীবনে কাজের সময়ের চেয়ে যেন অবসর সময় বেশী হয়ে না যায়। আর কর্মশূন্য সময় যেন কর্মপূর্ণ সময়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে না ফেলে এবং প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়ে না যায়। এমন যেন না হয় যে, অবসর সময়টাই জীবনের মূল ও সারাংশে পরিণত হয়ে বসেছে আর কর্মময় সময় হয়ে গেছে প্রাসঙ্গিক বা পার্শ্ব বিষয়।

আমার তো মন চায় আরেকটু বাড়িয়ে এ পর্যন্ত বলি যে, তোমাদের অবসর সময়গুলো যেন কর্মময় সময়ের মত বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়, আকল-বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয়। উদাহরণ দিয়েই বিষয়টি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। যেমন ধর, আমরা কাজের ক্ষেত্রে কোন না কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করি এবং কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই কাজ করি। তেমনি ভাবে অবসর ও কর্মহীন সময়গুলোও যেন কোন না কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় হয়। যেমন, শারীরিক সুস্থতা অর্জনের জন্য শরীরচর্চামূলক বৈধ খেলাধুলা বা মানসিক তৃপ্তির জন্য কোন ইলমী মুতালা'আ কিংবা রূহানী খোরাকের জন্য কুরআন তেলাওয়াত, হাদীছ অধ্যয়ন বা নফল ইবাদত বন্দেগী ইত্যাদিতে মগ্ন থাকা। অর্থাৎ কোন একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যেন তোমার অবসর সময়টা কাটে। অবসর মানে একেবারেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা, এমনটা যেন না হয়। অবসরেই যেন মনের শান্তি ও দেহের তৃপ্তির মত কোন কাজ করে ফেলা হয়। অবসর যেন একবারে ফায়দাশূন্য না হয়। অন্যথায় তোমার অবসর যাপন হবে সময় নষ্ট করা; বরং বলা যায় সময়কে 'হত্যা' করা। আর সেটা তো কখনো বৈধ হতে পারে না। কেননা, এই সময়ই তো তোমার জীবন। তাহলে সময়কে হত্যা করা তো জীবন হত্যা, বরং আত্মহত্যারই নামান্তর।

রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন সম্ভব

যারা দীর্ঘ সময় দাবা, পাশা ও অন্যান্য শরীয়ত নিষিদ্ধ ক্রীড়া বিনোদনে লিপ্ত থাকে, এমনিভাবে যারা চা পানের দোকানে, যেখানে সেখানে অহেতুক সময় অতিবাহিত করে থাকে, তাদের এই কাজ তো কখনো বিবেক-সম্মত হতে পারে না। তাদের এসব অবস্থা বিবেক তো কখনো অনুমোদন করতে পারে না। এসবের মাধ্যমে সময়কে বধ ও বরবাদ করা ছাড়া তো আর কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। হায়! মনে হয়, সময় যেন তাদের শত্রু।

এই সমস্যার সমাধান এবং এই রোগের চিকিৎসা এভাবে হতে পারে যে, প্রথমতঃ মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে এবং তাকে দৃঢ়ভাবে লালন করতে হবে যে, মানুষ সচেষ্ট হলে তার পছন্দ ও অপছন্দের পথ ও বিষয় যেভাবে ও যেদিকে ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারে এবং সে তার শওক ও আগ্রহকেও যে পথে ইচ্ছা চালাতে পারে। তাহলে সে নিজেকে এমন সব বিষয়ে এবং কাজে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে যার প্রতি ইতোপূর্বে সে আগ্রহী ছিল না। তেমনিভাবে এমন বিষয় ও কাজকে অপছন্দ ও ঘৃণা করতে পারে, যাকে সে আগে পছন্দ করত এবং স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করত।

তাই বলা যেতে পারে, যদি তার মনোবল দৃঢ় হয়,ইচ্ছা শক্তি প্রবল হয়, তবে সে অবসর সময়গুলোকে তার সুস্থতা, বুদ্ধিমত্তা বা ধার্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের মত হিতকর কাজে ব্যয়ে অভ্যস্ত হতে পারে। যদিও সে ও তার মন ইতোপূর্বে এতে অভ্যস্ত ছিল না।

একটি ভ্রান্ত ধারণা

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বড় আফসোসের সাথে বলতে হয়, অধিকাংশ মানুষ এখন মনে করে, বরং বলা যায় বিশ্বাস করে যে, অসার গল্প-উপন্যাস এবং মানহীন পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির পঠনই জ্ঞান আহরণের জন্য যথেষ্ট। ফলে শিক্ষানবিশরা সেগুলো অবাধে গলাধঃকরণ করছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক তৃপ্তির জন্য সেগুলোকেই উপযোগী ও যথেষ্ট মনে করছে। কিন্তু ফল হচ্ছে হিতে বিপরীত। কিন্তু এ সকল বিষয়বস্তু তো তাদের মন-মস্তিষ্ককে অবশ ও বিবশ করে দেয় এবং তাদের যৌনানুভূতিকে সজাগ করে। ফলে তারা হয়ে পড়ছে আরও অশান্ত ও উশৃঙ্খল।

ছাত্রকে ভাবতে হবে

আমার তো বিশ্বাস, সামান্য ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ইচ্ছাশক্তির একটু দৃঢ়তা একজন ছাত্রকে নিরবচ্ছিন্ন পঠন ও উপকারী অধ্যয়নে আগ্রহী করে তুলতে পারে। আর প্রতিটি শিক্ষার্থীই সক্ষম– নিজের ইচ্ছা শক্তিকে আন্দোলিত করতে, নিজের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করতে এবং জ্ঞানের কোন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা রাখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। চাই তা সাহিত্য, প্রকৌশল বা প্রাণীবিদ্যা হোক, কিংবা হোক কোন যুগের ইতিহাস বা অন্য কোন শাস্ত্র। ইচ্ছা শক্তি ও আভ্যন্তরীণ আন্দোলনে সে এসকল বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়নে ব্রতী হবে, তার গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করবে এবং দিনের একটা নির্ধারিত অংশে নিয়মিত সে বিষয়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে। আর এসব কাজে সব সময় নিজেকে আগ্রহী ও উদ্দীপ্ত রাখার চেষ্টা করবে।

তাকে নিজের মাঝে বিভিন্ন ভাবনা জাগরুক রাখতে হবে, যা হবে তার চালিকা শক্তি। তাকে ভাবতে হবে যে, সে এখন ভিন্ন এক মানুষ, তার রয়েছে বিশেষ এক শক্তি, সম্মানিত এক ব্যক্তিত্ব। সে এখন নিজের জন্য, স্বজাতির জন্য এবং প্রজন্মের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

এ পথে তাকে ভাবতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় এ জাতি তার সন্তানদের দ্বারা সমৃদ্ধ। সুতরাং জীবনের কোন ক্ষেত্রে বা জ্ঞানের কোন পথে কেউ বিশেষ জ্ঞান ও উৎকর্ষ কামনা করলে সে তাঁদের কারো উপর ভরসা করতে পারে। তাঁদের জীবনী ও জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে পথের দিশা ও পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে।

তাছাড়া জ্ঞানীদের মজলিসে নানাবিধ ইলমী, আমলী ও আখলাকী আলোচনা হয়। তখন বহু মূল্যবান কথা-বার্তা বেরিয়ে আসে, বহু উন্নত চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ পায় এবং একে অন্য থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। ফলে জীবন সজীব ও সমুজ্জ্বল হয়। সে তাঁদের মজলিস থেকে মূল্যবান মণি-মাণিক্য লাভ করতে পারে।

এছাড়াও এখন তো শিক্ষা-সংস্কৃতি অনেক উন্নত হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেক ব্যাপকতা লাভ করছে, জীবন ও জীবন-যাত্রার মানে বহু উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এখন কেন সে পারবে না তাঁদের মত হতে! পৃথিবীকে জ্ঞান ও কর্মের নতুন নতুন ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতে!!

এসব কথা যখন সে বারবার শুনবে, বারবার ভাববে তখন সে উপলব্ধি করতে পারবে– তার উপরও রয়েছে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাকেও নিয়মিত মস্তিষ্ককে খোরাক যোগাতে হবে, যেমন সে উদরকে যোগায়। কারণ, খোরাক যেমন দেহ ও জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন তেমনি মন-মস্তিষ্কেরও। আর সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন ও তার থেকে সর্বোচ্চ উপকার গ্রহণের চেষ্টা ছাড়া মস্তিষ্কের খোরাকের কল্পনাও করা যায় না।

তখন ধীরে ধীরে ব্যক্তি, তারপর সমাজ, তারপর দেশ উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকবে– সকল ক্ষেত্রে, সর্বদিক থেকে।

চেষ্টার অব্যাহততা জরুরি

প্রিয় পাঠক, আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকের কাছে জবাবদিহিতাকে তুমি নিজের অভ্যাস বানিয়ে নাও। নিজেকে সব সময় প্রশ্ন কর, অবসর সময়ে আমি কী করছি? আমি কি তা নিজের বা অন্যের স্বাস্থ্য, অর্থ বা জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে ব্যয় করছি?

আর সবসময় লক্ষ রাখ, তোমার কর্মশূন্য ও অবসর সময়টুকু বিবেক নিয়ন্ত্রিত থাকছে কি না? তাহলে তো নিশ্চয় তা কোন ভাল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে। যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে তো তুমি সফল বা তোমার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় তুমি এসব গুণ ও অভ্যাস চরিত্রে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাও এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনা অব্যাহত রাখ। আর অব্যাহত চেষ্টার ফল তো সফলতা বৈ কিছু নয়।

আরবী ভাষার কবি কত সুন্দর বলেছেন,

أخلقْ بذى الصبر أن يَحظى بحاجته ✪ ومُدمنُ القرعِ للأبواب أن يلجا

অর্থ ঃ ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার প্রয়োজন লাভের উপযুক্ত
আর অবিরাম দরজায় করাঘাতকারী গৃহে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে।

তবে এটাও আমাদের জেনে রাখা দরকার, খুব দীর্ঘদিন যাবৎ কোন নির্দিষ্ট কাজে সময়কে বেঁধে রাখা যায় না। কেননা, জীবনের পট সদা পরিবর্তনশীল। কখনো এমনও হতে পারে যে, তা ধারণারও বহু ঊর্ধ্বে তোমাকে নিয়ে যাবে, কল্পনাতীত উৎকর্ষ দান করবে।

আবার কখনো হয় তার বিপরীত। তবে জীবনচক্র যেদিকেই আবর্তিত হোক তোমার চিন্তা-ভাবনা থাকবে সর্বদা উন্নতির। আর চেষ্টা-সাধনা থাকবে সদা ঊর্ধ্বগতির।

জীবনকে ধারণ নয় 'যাপন' কর

প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার জীবনকে যে পরিমাণ ধারণ করে তার অতি সামান্যই সে 'যাপন' করে। বলা যায়, যেভাবে জীবনকে যাপন করা উচিৎ তার এক দশমাংশও সে করে না। না শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, আর না স্বাস্থ্য ও অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে। বাকী অংশগুলো তারা অনর্থক ব্যয় করে। অবহেলা অলসতায়, খেল-তামাশা বা গাল-গল্পে নষ্ট করে।

আমার তো মনে হয়, যথাযথভাবে সময়কে (তাদের) মূল্যায়ন না করা এবং জীবনকে যেভাবে যাপন করা উচিৎ সেভাবে যাপন না করার কারণ হল– সময়ের সঠিক ব্যবহার ও তাকে ভালো কাজে পূর্ণ করে রাখার এবং শরীয়ত ও বিবেকের মাপকাঠিতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার পন্থা ও পদ্ধতি তারা জানে না।

(উস্তায আহমদ আমীনের বক্তব্য সমাপ্ত হল)

সময়ই তো জীবন

উস্তায হাসানুল বান্না র. الوقتُ هو الحياةُ (সময়ই জীবন) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "বলা হয়ে থাকে, সময় হল স্বর্ণখণ্ড কিংবা অমূল্য রত্ন। কিন্তু একথাটি তাদের জন্য যারা বস্তুগত মূল্য ছাড়া কোন কিছুকে মূল্যায়ন করতে জানে না।

তবে যাদের দৃষ্টি এর চেয়েও দূরে, এর চেয়েও ভিন্ন তাদের জন্য বলা যায়, সময় তো তোমার জীবনকাল ছাড়া অন্য কিছু নয়। বলো তো ভাই! তোমার জীবনটা কী, শুধু জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে কেটে যাওয়া সময়টুকু ছাড়া?

ধন-সম্পদ তো এই আসে, এই ফুরিয়ে যায়, এরপরও মানুষ যে ধন-সম্পদ হারায় তার বহুগুণ অর্জন করতে পারে। কিন্তু সময় সম্পদ থেকে যা ফুরিয়ে যায় এবং হারিয়ে যায়, তা কি কখনো ফিরে আসে? তার কি কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটে? নিশ্চয় না। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় সময় স্বর্ণের চেয়েও দামী, হীরার চেয়েও মূল্যবান। কেননা, সময়ের সীমিত পরিধিতেই বেষ্টিত মানবজীবন।

সফলতা শুধু সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও অনুকূল পরিস্থিতির মাধ্যমেই আসে না। বরং তা উপযোগী মুহূর্তের উপরও নির্ভর করে। তাই তো পূর্ববর্তী মনীষীগণের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা যেমন ত্বরিত ও

তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতেন। তেমনি বিরত থাকতেন বিলম্বিত সিদ্ধান্ত থেকেও, বরং সঠিক ও উপযোগী সময়ের প্রতিই লক্ষ রাখতেন। আর সফলতা তো সঠিক ও উপযুক্ত মুহূর্তে কাজ করার মাঝেই নিহিত।

এই মুনাছিব ও উপযুক্ত মুহূর্তের প্রতি লক্ষ না রাখার এবং তা উদঘাটনে গভীরভাবে চিন্তায় মনোনিবেশ না করার কারণেই মানুষ ব্যর্থতা, হতাশা ও ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হয়। তাদেরকেই (কুরআনে) বলা হয়েছে, গাফেল ও উদাসীন। বলা হয়েছে, পশুর চেয়েও অধম।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلٰئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ ○

অর্থ ঃ আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে, তা দ্বারা শ্রবণ করে না; এরা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল। –সূরা আ'রাফ : ১৭৯

সময় সংরক্ষণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতইনা সুন্দর বলেছেন–

ما منْ يومٍ ينشقُّ فجره إلا ويُنادى : يا ابنَ آدمَ! أنا خلقٌ جديد، وعلى عملك شهيدٌ، فتزوَّدْ منى، فإنى لا أعود إلى يوم القيامة–

অর্থ ঃ প্রতিদিন যখন প্রভাত উদিত হয় তখন সে আহ্বান করে বলে, হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় গ্রহণে ব্রতী হও। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত আমি আর কখনো ফিরে আসব না।

প্রায় একই অর্থের আরেকটি হাদীছ–

ما منْ يومٍ طلعتْ شمسُه إلا يقولُ : من استطاعَ أن يعملَ فى خيرا فليعملْه، فإنى غيرُ مكرَّر عليكم أبدا ....–

অর্থ ঃ প্রতিদিন যখন সূর্য উদিত হয় তখন তা বলে, যে আমার মধ্যে কল্যাণকাজ করতে পারে, সে যেন তা করে নেয়। কেননা, তোমাদের কাছে কখনো আমার পুনরাগমন ঘটবে না।

অবশেষে তোমাকে বলছি বন্ধু!

আমাদের উল্লিখিত সব ঘটনা এবং সুদীর্ঘ আলোচনার পর এখন তো নিশ্চয় তুমি একথা স্বীকার করে নেবে যে সময়ের চেয়ে দামী, তার চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই; এবং কিছুই হতে পারে না।

আর জেনে রাখ-বন্ধু! সময় কিন্তু সর্বক্ষণ এক রকম হয় না, তার কল্যাণধারা ও দানপ্রবাহ এক রকম থাকে না। ফলে সুখ-সৌভাগ্যের তারতম্যেও পরিবর্তন ঘটে।

তাই তো দেখা যায়, কোন কোন সময় অন্য সময় থেকে অধিক কল্যাণপ্রসূ, কোন দিন অন্যদিনের চেয়ে বেশী মর্যাদাপূর্ণ এবং কোন মাস অন্য মাসের চে' অধিক সম্মানিত। কবির ভাষায় :

هو الجَدُّ حتى تفضلُ العينُ أختَها ✪ وحتى يكون اليوم لليوم سيدا

অর্থ : আর তা হল নসীব, এমন কি তোমার এক চোখ অন্য চোখের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং এক দিন আরেক দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাঁর উম্মতকে বার বার সতর্ক করেছেন, বহু হাদীছে উল্লেখ করেছেন সময়ের সদ্ব্যহারের কথা এবং তা থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার পন্থা। যেমন ইঙ্গিতার্থে এক হাদীছে বলেন,

المؤمنُ بين مخافتين : بينَ عاجلٍ قد مضى، لا يَدرى ما الله صانع فيه، وبين آجلٍ قد بقى لا يدرى ما الله قاضٍ فيه –

অর্থ : মু'মিন দুই শঙ্কাকালের মাঝে থাকে। একটি কাল হল যা অতিবাহিত হয়েছে (তথা, বিগতকাল), কিন্তু সে জানে না– সে ব্যাপারে আল্লাহ কী করবেন, অন্যটি হল ভবিষ্যতকাল), আর সে জানে না আল্লাহ তাতে কী ফায়সালা করবেন।

তাই প্রত্যেকের উচিৎ নিজের উপকারার্থে নিজের থেকে কাজ আদায় করে নেয়া, এবং আখেরাতের ফসলের জন্যে দুনিয়ার শস্যক্ষেত্রে শ্রম দিয়ে যাওয়া। বার্ধক্যের পূর্বেই তারুণ্য ও যৌবন থেকে সাধনা-সম্পদ অর্জনে ব্রতী হওয়া এবং মৃত্যুর পূর্বেই জীবনকে, তথা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সময়কে মূল্যায়ন করা।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

প্রিয় পাঠক! বার বার একই কথা বলে যাচ্ছি, একই পথে আহ্বান করে চলছি– তোমার জীবনকে উপলব্ধি কর, সময়কে মূল্যায়ন কর। তা তো ধারালো তরবারির মত। তুমি তাকে না কাটলে, নিশ্চিতভাবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। আর কালক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার কর। এরচে' ক্ষতির কিছুই নেই। আর, ... আর আল্লাহর কাছে মকবুল কাজের এবং ফযিলতপূর্ণ সময়ের তাওফীক কামনা কর।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ আমাদের সকলকে সময়ের হেফাযত এবং সময়কে ইলমে নাফে' ও আমলে ছালেহ্ দ্বারা পূর্ণ রাখার তাওফীক দান করুন। আর আমাদেরকে তাঁদের দলে শামিল করুন, যাঁরা সময়ের মূল্য বোঝে এবং জীবনের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করে ফলে তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে না, এবং দেশ ও জাতিকেও প্রতারিত করে না। আর তারাই সুপথপ্রাপ্ত।

تم بعون الله ۔

সময়ের মূল্য বুঝতেন যাঁরা ■ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.
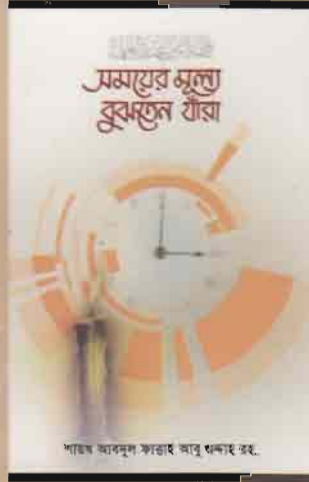
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুত তাক্বওয়া
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৬২-৪১৫০৭০